ড. মুসতফা আস-সিবাঈ

প্রাচ্যবিদদের ইসলামচর্চার নেপথ্যে

আবদুল্লাহ আল ফারুক

[অনূদিত]

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

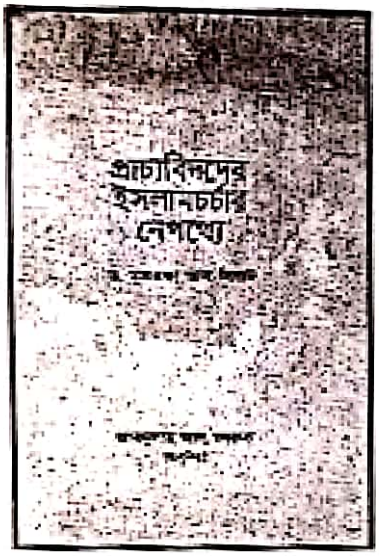
প্রাচ্যবিদদের ইসলামচর্চার নেপথ্যে

মূল
ড. মুসতফা আস-সিবাঈ

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আযহার

Scanned by CamScanner



প্রাচ্যবিদদের ইসলামচর্চার নেপথ্যে

ড. মুসতফা আস-সিবাঈ রচিত

আবদুল্লাহ আল ফারুক অনূদিত

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী, কালার ক্রিয়েশন

বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন, বাসাবো, ঢাকা

প্রকাশকাল : কিতাবমেলা ফেব্রুয়ারি ২০১৭

প্রকাশক : মাওলানা ওবায়দুল্লাহ

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য : একশ বিশ (১২০) টাকা মাত্র

Scanned by CamScanner

অর্পণ

মুসা আল হাফিজ

তাঁর *প্রাচ্যবিদদের দাঁতের দাগ* বইটি পড়েই
বক্ষ্যমাণ বইটি অনুবাদের উদ্যোগ নিই।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

■■ সূচিপত্র ■■

ড. মুসতফা আস-সিবাঈ // ৯
অনুবাদকের বিনীত কথা // ১২
ভূমিকা // ১৫
প্রাচ্যবিদ ও প্রাচ্যতত্ত্ব // ২০
ইসতিশরাক তথা প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস // ৩০
প্রাচ্যতত্ত্বের কর্মক্ষেত্র // ৩২
প্রাচ্যতত্ত্ব উদ্ভবের নেপথ্য কারণসমূহ // ৩৩
১. ধর্মীয় চেতনা // ৩৩
২. সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা // ৩৪
৩. বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি // ৩৬
৪. রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি // ৩৭
৫. বুদ্ধিবৃত্তিক ও গবেষণাপ্রসূত কারণ // ৩৮
প্রাচ্যতত্ত্বের দূরভিসন্ধি ও উপকরণ // ৩৯
ক. বুদ্ধিবৃত্তিক সন্দেহ বিস্তার // ৩৯
১. নবী করীম সা.-এর নবুওয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা // ৩৯
২. ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত ধর্ম হওয়ার ওপর প্রশ্ন তোলা // ৪১
৩. হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা // ৪২
৪. ইসলামি ফেকাহর নিজস্ব মূল্যমাণ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা // ৪৩
৫. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপ্লব সফল করার ক্ষেত্রে আরবি ভাষার যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করা // ৪৪
খ. ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি // ৪৪
গ. অজানাকে জানার কৌতূহল // ৪৬
প্রাচ্যবিদরা কীভাবে তাদের দূরভিসন্ধি বাস্তবায়ন করছে? // ৪৯

Scanned by CamScanner

প্রাচ্যবিদ মহল কর্তৃক প্রকাশিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা // ৫২
বর্তমান যুগের কয়েকজন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদের
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই // ৫৪
এ জে আরবারি (A. J. Arberry) // ৫৪
আলফ্রেড জিওম (A. Geom) // ৫৪
ব্যারন কারা ডি ভক্স (Baron Carra de Vaux) // ৫৫
এইচ এ আর গিব (H. A. R. Gibb) // ৫৫
গোল্ড যেহের (Gold Ziher) // ৫৬
জন মাইনার্ড (Jhon Maynard) // ৫৬
এস এম জুইমার (S M Zweimer) // ৫৬
আযীয আতিয়্যা সুরিয়াল // ৫৬
জি, ভন গ্রাউনবাম (G. Von Graunbaum) // ৫৭
ফিলিপ হিট্টি (Ph. Hitti) // ৫৮
এ জে ওয়েনসিংক (A. J. Wensink) // ৫৯
কে ক্রাগ (K. Cragg) // ৫৯
এল ম্যাসিগনন (L. Massignon) // ৫৯
ডি.বি. ম্যাকডোনাল্ড (D. B. Macdonald) // ৬০
এম গ্রিন (M Green) // ৬০
মাজীদ কুদুরি (Majid Qudoori) // ৬০
ডি. এস. মার্গোলিউথ (D. S. Margoliouth) // ৬১
আর. এন. নিকলসন (R. N. Nickolson) // ৬১
এইচ পি এইচ (H. P. H.) // ৬১
হেনরি ল্যামান্স (H. Lammens) // ৬১
যোসেফ স্ক্যাচ (J. Schacht) // ৬২
প্রাচ্যবিদদের এমন কিছু বিপদজনক রচনা– যা কারো কারো
কাছে সমাদৃত // ৬৩
বিশ্বকোষ // ৬৩
অপরাপর প্রসঙ্গে // ৬৩
প্রাচ্যবিদদের গবেষণা ও নিরীক্ষণের মাপকাঠি// ৬৭
পশ্চিমা প্রাচ্যবিদদের মুখোমুখি // ৭৮
সর্বশেষ নিবেদন // ৮৯

Scanned by CamScanner

ড. মুসতফা আস-সিবাঈ

পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁদের নাম চিরকাল সংগ্রামী মহাবীরদের তালিকায় জ্বলজ্বল করছে, তাদেরই একজন ড. মুসতফা আস-সিবাঈ।

১৯১৫ সালে সিরিয়ার ঐতিহাসিক হিমস নগরীতে ঐতিহ্যবাহী আলেম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি যখন মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অভিযোগে তৎকালীন পুতুল সরকার তাকে গ্রেফতার করে।

মিসরে থাকাবস্থাতেই তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আলবান্নার সঙ্গে পরিচিত হন। সিরিয়ায় ফিরে আসার পরও তাঁদের দু'জনের মাধ্যমে গভীর হৃদ্যতা বজায় থাকে। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি মিসরের দ্বীনদার সুধীসমাজকে সঙ্গে নিয়ে মুসলিম ব্রাদারহুড ইন সিরিয়া গড়ে তুলেন। ১৯৪২ সালে সংগঠনটির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি 'আল-মানার' 'আশ-শিহাব' 'আল-মুসলিমূন' অনেকগুলো পত্রিকা সম্পাদন করেছেন। ১৯৪৯ সালে তিনি দামেশকের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এমনকি তিনি ৯ সদস্যবিশিষ্ট সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্যপদও অলঙ্কৃত করেছেন।

এর বাইরে ১৯৫০ সালে সিরিয়া ইউনিভার্সিটির অধিকার অনুষদের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ সালে তিনি দামেশক ইউনিভার্সিটির শরীয়াহ অনুষদের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ মনোনীত হন।

১৯৫৬ সালে যখন সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব নিয়ে আরব-ইয়াহুদি যুদ্ধ বাঁধে তখন ড. মুসতফা আস-সিবাঈ সিরীয় সরকারের ওপর যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে তীব্র চাপ প্রয়োগ করেন এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্যদেরকে

Scanned by CamScanner

সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে গমনের জোরালো আবেদন পেশ করেন। তাঁর এই কঠোর অবস্থানের কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে তৎকালীন সিরীয় সরকার তাকে সিরিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপনার পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে লেবাননে নির্বাসিত করে।

ড. মুসতফা আস-সিবাঈ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশেষত ইসলামি ফিকাহর ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানগভীরতা ছিলো প্রবাদপ্রতীম। তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাগুলো মৃত্যুর প্রায় পৌনে শতাব্দী পর আজও তাকে অমর করে রেখেছে। তাঁর কিছু অসাধারণ রচনা হলো—

১. السنة ومكانتها في التشريع

২. شرح قانون الأحوال الشخصية [তিন খণ্ডে]

৩. من روائع حضارتنا

৪. المرأة بين الفقه والقانون

৫. عظماؤنا في التاريخ

৬. القلائد من فرائد الفوائد

৭. دروس في دعوة الإخوان المسلمين

৮. هكذا علمتني الحياة

৯. اشتراكية الإسلام

১০. أخلاقنا الاجتماعية

১১. أحكام الصيام وفلسفته

১২. الدين والدولة في الإسلام

১৩. نظام السلم والحرب في الإسلام

১৪. هذا هو الإسلام

১৫. السيرة النبوية : دروس وعبر

১৬. الاستشراق والمستشرقون : ما لهم وما عليهم

১৭. المرونة والتطور في التشريع الإسلامي

১৮. منهجنا في الإصلاح

Scanned by CamScanner

١٩. العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في التاريخ

٢٠. التسامح الديني

٢١. التكافل الإجتماعي في الإسلام

٢٢. جهادنا في فلسطين

٢٣. مشروعية الإرث وأحكامه

٢٤. آلام وآمال

٢٥. الصراع بين القلب والعقل

٢٦. أصدق الاتجاهات الفكرية في الشرق العربي

٢٧. مقدمة حضارة الإسلام

বিশেষত তাঁর বিশ্বনন্দিত গ্রন্থ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي তাঁকে বৈশ্বিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। ব্যাপক সমাদৃত এ বইটিকে বোদ্ধামহল সংশ্লিষ্ট প্রতিপাদ্যের ইনসাইক্লোপিডিয়া অভিহিত করে থাকেন। বইটি রচনার পর এতো বছর পেরিয়ে গেছে; অথচ সে মানের আরেকটি বই বিশ্বের কোথাও আলোর মুখ দেখেনি। বইটি মাকতাবাতুল আযহার, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এ লেখকের আরেকটি কালজয়ী গ্রন্থ হলো— الاستشراق والمستشرقون : ما لهم وما عليهم। যার বাংলারূপ 'প্রাচ্যবিদদের ইসলামচর্চার নেপথ্যে'। ওরিয়েন্টালিস্ট তথা প্রাচ্যবিদদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে বইটি ব্যাপক ভূমিকা রাখবে— এমন আশাবাদ থেকেই বইটি অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছি।

এই মহান সংগ্রামী কর্মবীর, শেকড়সন্ধানী গবেষক ও রাজপথ কাঁপানো সৈনিক ১৯৬৪ সালে ইনতিকাল করেন।

আবদুল্লাহ আল ফারুক
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঈ.

Scanned by CamScanner

অনুবাদকের বিনীত কথা

সকল প্রশংসা এককভাবে মহান আল্লাহর। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি নতুন নয়। ইতিহাসের লজ্জাকর এ বিষয়টি শত শত বছর ধরে চলে আসছে। ইসলামের বক্ষের ওপর ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের প্রতারণা ও শঠতার ছোরা বহুবার বিদ্ধ হয়েছে। রক্তঝরা উপাখ্যানের ভুরি ভুরি উদাহরণ ইতিহাসের পাতাগুলোকে রক্তাক্ত করে রেখেছে।

মুসলিম জাহানের এমন কোনো ভূখণ্ড নেই যেখানে পশ্চিমারা তাদের বিষবাষ্প ছড়ায়নি। মুসলমানদের কোমল হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করেনি। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করা যায়– এমন প্রতিটি পথ ক্রুসেডাররা ব্যবহার করেছে। রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, শিল্প-সাহিত্য, বুদ্ধিচর্চা– তথা বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীর প্রতিটি প্রাকৃতিক ও মানবিক মাধ্যম ও উপকরণ তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে।

তারা তাদের বিদ্বেষী মনোভাব পূরণ করতে কখনও তরবারি-বন্দুক ব্যবহার করেছে, কখনও কাগজ-কলম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কখনও বাকশক্তি ও উপস্থাপনশৈলী কাজে লাগিয়েছে, কখনও শিল্প-সাহিত্যের পথে এগিয়েছে, আবার কখনও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ তারা বৈরীতা পূরণের সম্ভাব্য সকল পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

সেই ধারাবাহিকতায় আমরা এমন এক যুগে অবতীর্ণ হয়েছি, যখন পশ্চিমারা ইসতিশরাকের ছদ্মাবরণে ইসলামের শেকড় উপড়ে ফেলার এক অসম যুদ্ধের ডাক দিয়েছে। তাদের কূটকৌশল প্রসূত আক্রমণগুলো ইসলামের সীমান্ত-প্রাচীরে একের পর এক ফাঁটল সৃষ্টির কসরত করছে।

Scanned by CamScanner

পরিস্থিতি এতোটাই সমস্যাসংকুল। এমন নষ্ট সময়ে আমার মনে হলো, বাংলাভাষী জনতার হাতে ড. মুসতফা আস-সিবাঈর বিশ্বনন্দিত গ্রন্থ الإستشراق والمستشرقون : ما لهم وما عليهم এর বঙ্গানুবাদ তুলে দেওয়া দরকার। কারণ লেখক ও বিষয়বস্তু উভয় বিচারেই বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ড. মুসতফা আস-সিবাঈ হলেন মধ্যপ্রাচ্যের প্রথিতযশা আলেমে দ্বীন, প্রবাদপ্রতীম লেখক, শেকড়-সন্ধানী গবেষক ও অনন্য সাধারণ খতীব। তিনি ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের অসংখ্য চক্রান্ত খুব কাছ থেকে দেখেছেন। যার কারণে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ সারা বিশ্বে সুনাম কুড়িয়েছে। তিনি আমৃত্যু حركة الإخوان المسلمين এর পরিচালক ছিলেন। এর বাইরে দ্বীনের বহুবিধ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। বিশাল কর্মময় জীবনে দেশ ও জাতির কল্যাণে নানাবিধ অবদান রেখেছেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবন শেষে উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে যেই শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিলো, তা অদ্যাবধি পূরণ হয়নি। মহান আল্লাহ তাঁকে রহমতের আঁচলে ঢেকে নিন।

তাঁর অসাধারণ লেখনীশক্তির প্রমাণ তার বইগুলো। একজন সফল লেখক হিসেবে তিনি অনেকগুলো পাঠকনন্দিত গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। বিশেষত তাঁর বিশ্বনন্দিত গ্রন্থ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي তাঁকে বৈশ্বিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। ব্যাপক সমাদৃত এ বইটিকে বোদ্ধামহল সংশ্লিষ্ট প্রতিপাদ্যের ইনসাইক্লোপিডিয়া অভিহিত করে থাকেন। বইটি রচনার পর এতো বছর পেরিয়ে গেছে; অথচ সে মানের আরেকটি বই বিশ্বের কোথাও আলোর মুখ দেখেনি।

যেমনটি আমি ইতোপূর্বে বলেছি যে, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ড. সিবাঈর কালজয়ী গ্রন্থ الإستشراق والمستشرقون : ما لهم وما عليهم এর অনুবাদ। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি– মূল বইয়ের শব্দ, বাক্যগঠন ও ব্যঞ্জনা অক্ষুন্ন রাখতে। কিন্তু একটি স্পর্শকাতর বিষয়বস্তু ও গবেষণাঘনিষ্ট প্রতিপাদ্যের ওপর লেখা কালজয়ী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদে কতোটুকু সফল হয়েছি, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। হয়তো আমার আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু

Scanned by CamScanner

অনিচ্ছাকৃত প্রমাদ বা ত্রুটি রয়ে গেছে। জ্ঞানীমহল ও বুদ্ধিজীবী ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে— এমন কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে অবশ্যই আমাকে অবহিত করবেন। ইনশা-আল্লাহ, আপনার সুপরামর্শ ও প্রস্তাবনা সাদরে গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন ও রক্ষা করার চেষ্টা করবো।

আশা করি— অনূদিত বইটি জ্ঞানীমহল গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় যেই বিশাল শূন্যতা বিরাজ করছে, তার খানিকটা এ বইয়ের মাধ্যমে পূরণ হবে। মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুআ করি— তিনি আমার ছোট্ট এ অনুবাদকর্ম কবুল ও মঞ্জুর করুন এবং পরকালে আমার নাজাতের মাধ্যম বানিয়ে দিন।

আবদুল্লাহ আল ফারুক
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঈ.

Scanned by CamScanner



ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم، بارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه. أما بعد :

নিঃসন্দেহে এটি অনেক বড় আফসোসের বিষয় যে, খোদ মুসলমানরাই তাদের মহান ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন নয়। কোনো মুসলমানকে তার ইতিহাস জিজ্ঞেস করা হলে সে লজ্জায় মাথা নত করে নিশ্চুপ থাকে। সে জানে না যে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাব্‌য়ে-তাবেঈন রহিমাহুমুল্লাহ এই দ্বীনকে আঁকড়ে ধরার জন্যে, এই দ্বীনের সেবা করার জন্যে, এই দ্বীনের গোড়ায় পানি সিঞ্চন করার জন্যে কী পরিমাণ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তারা জানে না— তাদের সেই ঈমানদীপ্ত চেতনার সঙ্গে পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাসের পাতাগুলোতে কেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঘৃণ্য ও অপ্রিয় ঘটনাবলি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই দেখা যায় যে, এমন ইতিহাসের সামনে মুসলমানরা হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও পেরেশান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এমন চিত্র কোনো মর্দে মুমিনকে কখনই মানায় না।

এর নেপথ্যে প্রকৃত কারণ হলো, আমাদের ইতিহাসের ওপর অপবিত্র ও অবিশ্বস্ত কিছু হাত কলম চালিয়েছে। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের ওপর কালিমা লেপন ও তার স্বচ্ছ চেহারা বিকৃত করার ষড়যন্ত্র থেকেই তারা এই অপকর্ম করেছে। তারা মুসলিম উম্মাহর মনে সন্দেহের ইঁদুর অনুপ্রবেশ করিয়েছে। তারা এ কথা প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছে যে, মানবতার সঠিক আহ্বান ইসলামের মাধ্যমে যথাযথভাবে মানব সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছেনি।

Scanned by CamScanner

আজকাল স্কুল-কলেজ ও ইউনিভার্সিটিগুলোতে যেই ইতিহাস পড়ানো হয়, সেই ইতিহাস অধ্যয়ন করলে পরিষ্কার বুঝে আসে যে, সেই ইতিহাসের সেই বইগুলোতে মুসলিম উম্মাহর আলোকিত অতীতের মাঝে প্রাণঘাতী বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের যেই সন্তানরা ওরিয়েন্টালিস্টদের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠছে, তারা সেই বিষাক্ত ইতিহাস নিজ ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার জন্যে দিন-রাত একাকার করে খাটছে। প্রাচ্যবিদরা তাদের নিষ্পাপ অন্তঃকরণে এমনভাবে বিষাক্ত খোরাক ঢুকিয়ে দিচ্ছে যে, তারা আজীবনের জন্যে তাদের দাসে পরিণত হচ্ছে। এখন তাদের মুখ থেকে সেই কথাগুলোই বেরোচ্ছে, যা তাদেরকে তাদের মনিব শিখিয়ে দিয়েছে। এভাবেই প্রাচ্যবিদরা আমাদের এই সন্তানদের মাধ্যমে তাদের বুকের ভেতরে পুষে রাখা হিংসা ও বিদ্বেষ চরিতার্থ করছে। উদাহরণস্বরূপ আরব জাহানের ওপর উসমানি শাসনামলকে পেশ করা যেতে পারে। এই শাসনামলের ব্যাপারে অসংখ্য ও অগণিত বিদঘুটে ও উদ্ভব ঘটনাবলি ইতিহাসের পাতা কালো করে রেখেছে। প্রাচ্যবিদরা এ কথা ছড়ানোর চেষ্টা করেছে যে, তুর্কি মুসলমানরা ছিলো 'আরব জাহানের' ওপর দখলদার। তারা যুগে যুগে আরবদেরকে শোষণ করেছে। তুর্কি মুসলমানদের মাঝে যেই ইসলামি চেতনা ও বিশ্বাস ছিলো, তাদের রক্তে ইসলামের যেই ঐতিহ্য প্রবহমান ছিলো, প্রাচ্যবিদরা সেই চেতনা ও ঐতিহ্য এ কথা বলে ধামা-চাপা দেওয়ার অপচেষ্টা করেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যেই তুর্কি মুসলমানরা তাদের ইসলামি বিশ্বাসকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

শুধু তাই নয়; প্রাচ্যবিদরা ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়েও ছিনিমিনি খেলেছে। তারা বিশ্ববাসীর সামনে বাস্তবতা বিবর্জিত শতভাগ মিথ্যার আবরণে আবৃত চালচিত্র উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো— এর মাধ্যমে তারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ধূলিধূসরিত করবে। তারা চেয়েছিলো— ইসলাম পৃথিবীকে মানবতার যেই কালোত্তীর্ণ সওগাত উপহার দিয়েছে, তা বিশ্ববাসীর সামনে তুচ্ছ প্রমাণিত করবে। মুসলমানদের মনে ইসলামের প্রতি বিরাগ সৃষ্টির দূরভিসন্ধি থেকেই তারা এ ধরনের মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

Scanned by CamScanner

প্রাচ্যবিদরা শুধু ইসলামের ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টাই করেনি। তারা এর ওপর ক্ষ্যান্ত হয়নি; বরং তারা কালিমা লেপনের কুমতলব থেকে হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ তথা অপরাপর ইসলামঘনিষ্ট বিদ্যাগুলোও গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছে এবং এ ময়দানেও তারা তাদের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটিয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় তারা বিভিন্ন নস (نص) তথা আসমানি প্রত্যাদেশের মূল ভাষ্যের মাঝে বিকৃতি ঘটিয়েছে। যেসব স্থানে তারা বিকৃতির সুযোগ পায়নি সেসব স্থানে তারা অপব্যাখ্যা প্রদান ও জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

সীমাহীন দুঃখের বিষয় হলো, ইসলাম ও মুসলমানদের এমন কোনো বিষয় নেই, যার ওপর প্রাচ্যবিদরা তাদের রচনাবলির মাঝে আলোচনা করেনি। তাফসীর, হাদীস ও ফেকাহ থেকে শুরু করে শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, এমনকি প্রজন্মের মূল্যবোধ সম্পর্কিত শাস্ত্রগুলোর ওপরও তারা কলম ধরেছে। বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কলেজ ও ইউনিভার্সিটির গবেষক ও স্কলারদের কাছে তাদের বইগুলোই উৎসগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে বলেছি। যার ফলে দেখা যায়, ওই বিদ্যাপীঠগুলোর শিক্ষার্থীরা তাদের প্রভু ও মনিবদের চিন্তা-চেতনার উত্তরসূরী হয়ে থাকে।

এগুলো হলো মূল কারণ। এর বাইরে আরও অনেকগুলো কারণ রয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু আলেমে দ্বীন —যাদের অন্তরে এই দ্বীন, কুরআন ও উম্মাহর ব্যাপারে আত্মসম্মানবোধের প্রদীপ জ্বলজ্বল করে— তারা প্রতিবাদ ও অপনোদনের ঝাণ্ডা হাতে দাঁড়িয়ে গেছেন। তারা প্রাচ্যবিদদের অপচেষ্টাগুলোর মুখোশ উন্মোচন করে বিশ্ববাসীর সামনে প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। যেন তাদের সকল কুমতলব তাদের সামনে দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি সে ধরনেরই একটি প্রয়াস। যদিও আকার-অবয়বে তা নেহায়েত ছোট; কিন্তু তথ্য ও তত্ত্বের বিপুলতার বিচারে অবশ্যই অনেক বড়। পুস্তিকাটি রচনা করেছেন শ্রদ্ধেয় আব্বাজান ডক্টর মুসতফা আস-সিবাঈ। মহান আল্লাহ তাঁর কবর পবিত্র ও নির্মল রাখুন। তিনি সচেতন পাঠকবর্গের উপকারার্থে তাঁর বিভিন্ন রচনাবলি থেকে এ প্রতিপাদ্য

Scanned by CamScanner

সম্পর্কিত তথ্যগুলো এক মলাটে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছেন। ইতোপূর্বে এই তথ্যগুলো حضارة الإسلام পত্রিকা ও السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي গ্রন্থে বিক্ষিপ্তাকারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলো।

তিনি এর বাইরে আরও অনেক তথ্য সংযুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন; কিন্তু জীবন তাঁকে সঙ্গ দেয়নি। তথ্য সংযুক্তির আগেই তিনি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে পরপারে চলে যান। কাজেই এ পুস্তিকাটি ইসলামি দাওয়াতের ময়দানে শ্রমদানরত, আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন কর্মবীরদের হাতে ইতিহাসের অমূল্য আমানত।

মহান আল্লাহ তাঁর ওপর দয়া করুন। তিনি তাঁর ওপর নিজ রহমত ও দয়া বর্ষণ করুন। ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তম বিনিময় দিন।

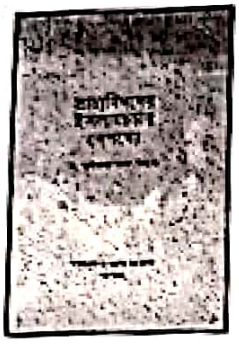
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

— হাসান মুসতফা আস-সিবাঈ

Scanned by CamScanner

প্রাচ্যবিদদের ইসলামচর্চার নেপথ্যে

Scanned by CamScanner



প্রাচ্যবিদ ও প্রাচ্যতত্ত্ব

প্রাচ্যবিদ ও প্রাচ্যতত্ত্ব— এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত যারাই কলম ধরেছেন তাদের কেউই বিস্তৃত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেননি। তাদের কারোর লেখাতেই প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ভালো-মন্দ, উপরন্তু প্রাচ্যবিদদের কর্মকাণ্ড, অবদান, শুদ্ধ-অশুদ্ধ গবেষণা ও কলমচর্চা সম্পর্কে যথাযথ আলোকপাত হয়নি। বরং এর বিপরীত দিকটাই ফুটে উঠেছে। তাদের অনেককে প্রাচ্যবিদদের প্রতি অন্ধ-শ্রদ্ধা ও অতিভক্তি করতে দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপ আপনি স্যার নজিব আকিকীর লেখা المستشرقون বইটি দেখতে পারেন। বড়জোর কারো কারো লেখায় তাদের সাম্রাজ্যবাদী ও মিশনারী দূরভিসন্ধির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উঠে এসেছে।

হ্যাঁ, এ বিষয়ের ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেছেন ডক্টর মুহাম্মদ আল-বাহী। তিনি জামে' আযহারের বিশাল সেমিনার কক্ষে যেই গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করেছেন, তা সর্বোতভাবে অত্যন্ত মূল্যবান। বর্তমানে তিনি ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটিতে ইসলামি সভ্যতা অনুষদের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

বর্তমান যুগে আমাদের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা প্রাচ্যবিদদের ওপর সীমাতিরিক্ত আস্থা রাখে। প্রাচ্যবিদদের সাধনা ও অবদানের প্রশংসায় তাদের মুখে রীতিমত খৈ ফুটতে থাকে। তাদেরই একজন হলেন ডক্টর ত্বহা হুসাইন[১]। আমাদের আধুনিক আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি

---

[১] ত্বহা হুসাইন। জন্ম- ১৮৮৯। মৃত্যু- ১৯৭৩। আধুনিক আরবী সাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কিন্তু পাশ্চাত্যের রাহুগ্রাসে জড়িয়ে পড়ে একসময় আলো খুইয়ে ব্যক্তিগতভাবে ম্লান

Scanned by CamScanner

হলেন প্রাচ্যবিদদের প্রথম সারির শিষ্য। তিনি তার লেখা الأدب الجاهلي [আল-আদাবুল জাহিলী] গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন,

وكيف تتصور أستاذا للأدب العربي لا يلم ولا ينتظر أن يلم بما انتهى إليه الفرنج (المستشرقون) من النتائج العلمية المختلفة حين درسوا تاريخ الشرق وأدبه ولغاته المختلفة، وإنما يُلتمس العلم الآن عند هؤلاء الناس، ولا بد من التماسه عندهم: حتى يتاح لنا نحن أن ننهض على أقدامنا، ونطير بأجنحتنا، ونسترد ما غلبنا عليه هؤلاء الناس من علومنا وتاريخنا وآدابنا.

'কীভাবে এমন ব্যক্তিকে আরবি সাহিত্যের শিক্ষাগুরু হিসেবে মেনে নিচ্ছো, যার ফরাসি (ওরিয়েন্টালিস্টদের) গবেষণালব্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে অবগতি নেই। অথচ তারাই সার্থকতার সঙ্গে প্রাচ্যের সাহিত্য, ইতিহাস ও এতদাঞ্চলের বিভিন্ন ভাষার ওপর গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। বাস্তবতা হলো, আপনাকে যদি এ যুগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয় এবং নিজস্ব পাখায় ভর করে উড়তে হয় তাহলে অবশ্যই তাদের কাছ থেকেই বিদ্যা অর্জন করতে হবে। তারা যেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের মাধ্যমে আমাদেরকে পেছনে ফেলেছে, তা তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনাই স্বাবলম্বী হওয়ার একমাত্র পথ।'

হয়ে পড়ে এ জ্যোতিষ্ক। কিন্তু তার কর্ম আজও স্বমহিমায় ভাস্বর।

في الشعر الجاهلي,الأيام, شجرة البؤس, المعذَّبون في الأرض , على هامش السيرة, الوعد الحق, حديث الأربعاء তার উল্লেখযোগ্য কর্ম। তার অনেক গ্রন্থ বাংলাদেশে পাওয়া যায়। ইন্টারনেট ডাউনলোড করেও সবগুলো পড়া যাবে।

ত্বহা হুসাইনের রচনাবলি অনেকেই সতর্কতার সঙ্গে অধ্যয়নের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে উস্তায আনওয়ার জুন্দী র. এর مؤلفاتٌ في الميزان সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাই প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের ত্বহা হুসাইনের গ্রন্থাবলি না পড়া উচিত। ইসলামী আক্বীদা, উলূমুল কুরআন ও উলূমুল হাদীস, ইসলামী ইতিহাস ও আরবী সাহিত্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারীদেরই কেবল ত্বহা হুসাইনকে পড়া যেতে পারে। -মিডিয়া আরবি কীভাবে শিখবো :

Scanned by CamScanner

সন্দেহ নেই, ডক্টর তোয়াহার এ জাতীয় কথাগুলো সেই চৈন্তিক দাসবৃত্তির যুগের প্রতিনিধিত্ব করে, যেই যুগ আমরা অতিবাহিত করেছি আমাদের আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও মানসিক উন্মেষের সূচনাকালীন দিনগুলোতে। তার লেখা الأدب الجاهلي [আল-আদাবুল জাহিলী] গ্রন্থটি সেই চৈন্তিক দাসত্বের পরিষ্কার দৃষ্টান্ত। মার্জিলিউসের মতো কট্টোর ও উগ্র প্রাচ্যবিদ ইসলাম ও আরবের বিরুদ্ধে যেই বৈরী চিন্তা-চেতনা লালন করে, ডক্টর তোয়াহার এ বইটি হলো সেই ভ্রষ্টাচারের সোচ্চার প্রতিধ্বনি। তার যাবতীয় চিন্তা-চেতনাকেই তিনি الأدب الجاهلي [আল-আদাবুল জাহিলী] গ্রন্থে নকল করে নিজের দিকে সম্বন্ধিত করেছেন। বাস্তবতা হলো, এর বাইরে এ গ্রন্থের মাঝে এমন কোনো নতুন তথ্য আসেনি, যা ডক্টর তোয়াহা জ্ঞানচর্চার পথে যৎসামান্য কসরত করে, বা গবেষণার অল্পবিস্তর ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য করে আবিষ্কার করেছেন।

এদেরই আরেকজন হলেন আহমদ আমীন মিসরি।[২] তিনি তার লেখা فجر الإسلام [ফাজরুল ইসলাম] ও ضحى الإسلام [দুহাল ইসলাম] গ্রন্থে সেই চৈন্তিক দাসবৃত্তির চর্চাটাই করেছেন। তিনি فجر الإسلام [ফাজরুল ইসলাম] গ্রন্থের 'আল-হাদীস' অধ্যায়ে প্রাচ্যবিদদের চিন্তা-চেতনা চুরি করে তাদের

---

২. আহমদ আমীন। জন্ম: ১৮৮৬ ঈসাব্দ। সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হলেও সাহিত্যের চেয়ে ইতিহাসই বেশি লিখেছেন। এ হিসেবে একজন সাহিত্যিকের চেয়ে একজন ঐতিহাসিক, চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবি অভিধা পাওয়ারই বেশি উপযুক্ত তিনি।

يوم الإسلام ও فجر الإسلام, ضحى الإسلام, ظهر الإسلام নামে ইসলামের ইতিহাস ও বুদ্ধিবৃত্তিক সিরিজ রচনার মাধ্যমেই তিনি খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যান। فيض الخاطر নামে তার দশ ভলিউমের বিশাল গ্রন্থ রয়েছে। সাহিত্যের পাশাপাশি চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক খোরাক যোগানোর ক্ষেত্রে আহমদ আমীনের গ্রন্থগুলো অনন্য। তার অনেক গ্রন্থ বাংলাদেশে পাওয়া যায়। পাশাপাশি ইন্টারনেট থেকেও সবগুলো ডাউনলোড করা যাবে। حياتي তার আত্মজীবনী গ্রন্থ; যা সমকালীন ইতিহাসের সম্ভারও বটে।

তবে আহমদ আমীনেরও প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। বিশেষত তিনি অসংখ্য উলামা কর্তৃক মুনকিরে হাদীস হিসেবে আখ্যা পেয়েছেন। তাই ফাজরুল ইসলাম ও দুহাল ইসলামের অনেক জায়গায় সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য; আবু হুরাইরা রা., হাদীস সংকলনের ইতিহাস ও ইমাম বুখারী, উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় খলীফা ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন অযাচিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। -মিডিয়া আরবি কীভাবে শিখবো : ৪৮২

Scanned by CamScanner

দিকে সম্বন্ধিত না করার যেই ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন তা আমি আমার সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي এর মাঝে আলোচনা করেছি।

প্রাচ্যবিদদের আরেক চিন্তানুবর্তী হলেন ডক্টর আলী হাসান আবদুল কাদের। তিনি তার লেখা نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي গ্রন্থে তাদের প্রতিনিধিত্বই করেছেন। গোল্ড যেহের তার دراسات إسلامية [দিরাসাতুন ইসলামিয়্যাহ] ও العقيدة والشريعة في الإسلام [আল-আকীদাহ ওয়াশ শরীয়াহ] গ্রন্থদ্বয়ে যে কথাগুলো বলেছেন, তিনি নিজ বইয়ে সেগুলোর স্রেফ আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। তিনিও তার পূর্ববর্তীদের মতো অসাধুতার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি তার গ্রন্থে উপস্থাপিত চিন্তাধারা ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তার শিক্ষাগুরু প্রাচ্যবিদদের দিকে সম্বন্ধিত না করে খোদ তার নিজের দিকেই সংযুক্ত করেছেন।

যদ্দূর জানি, ডক্টর আলী হাসান আবদুল কাদের বর্তমানে লন্ডনের مركز الثقافي الإسلامي [মারকাযুস সাকাফিয়্যিল ইসলামী] প্রতিষ্ঠানে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। তার সঙ্গে আমার একটি চমৎকার ঘটনা রয়েছে। মনে হচ্ছে, ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করলে কিছু সুফল পাওয়া যাবে। সেই ঘটনাই পরবর্তীকালে আমাকে السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তার সঙ্গে আমার যে ঘটনাটি ঘটেছে, তার বিবরণ পেশ করার আগে আমি অকুণ্ঠে স্বীকার করছি যে, ডক্টর সাহেব অত্যন্ত সজ্জন মানুষ। আমি তাকে সচ্চরিত্রবান, গুণী ও নির্দ্বিধায় সত্য মেনে নেওয়ার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী পেয়েছি।

১৯৩৯ সালের কথা। আমরা তখন ল' কলেজে ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ ও শরীয়াহর ইতিহাসের সাবজেক্টগুলোর বিশেষ বিভাগের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। তখন আযহার কর্তৃপক্ষ শায়খ মারাগী রহ.[৩]-এর সময় ডক্টর আলী হাসান আবদুল কাদেরকে تاريخ التشريع الإسلامي

---

৩. পূর্ণ নাম মুহাম্মদ মুসতফা আল মারাগী। জন্ম– ৭ রবিউস সানী ১২৯৮ হিজরী, মুতাবেক ৯ মার্চ ১৮৮১ ঈসায়ি। মৃত্যু– ১৪ রমযান ১৩৬৪ হিজরী, মুতাবেক ২২ আগস্ট ১৯৪৫ ঈসায়ি। সাইয়্যেদ বংশের সন্তান। তিনি শায়খুল আযহার পদে দু' দু' বার সমাসীন ছিলেন। –উইকিপিডিয়ার সৌজন্যে

Scanned by CamScanner

[ইসলামি শরীয়াহর ইতিহাস] এর অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়। তিনি তখন সদ্য জার্মানি থেকে শিক্ষা সমাপন করে এসেছেন। এ ছাড়াও তিনি উসূলুদ দ্বীন অনুষদের ইতিহাস শাখার ওপরও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। আমার স্মৃতিশক্তি যদি আমার সঙ্গে প্রতারণা না করে তাহলে বলবো, তিনি জার্মানিতে চার বৎসর অবস্থান করেছেন এবং সেখান থেকে ফিলোসফি শাস্ত্রের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

প্রথম দিন পাঠকক্ষে এসে তিনি আমাদের উদ্দেশে বলেন— 'আমি শিগগিরি আপনাদেরকে تاريخ التشريع الإسلامي [ইসলামি শরীয়াহর ইতিহাস] পড়াবো। কিন্তু বিষয়টি আমি পড়াবো সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে। আযহারের ইতিহাসে কেউ কোনো দিন এমনভাবে পড়ায়নি। আমি নিঃশঙ্কোচে এ কথা স্বীকার করছি যে, আমি প্রায় চৌদ্দ বছর এই আযহারে পড়াশুনা করেছি। অথচ এ সময়কালে আমি ইসলাম বুঝিনি। আমি জার্মানিতে গিয়েই ইসলামকে যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছি।'

আমরা ছাত্ররা তার এ ধরনের কথায় যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলাম। তখন আমরা পরস্পরে বলাবলি করেছিলাম যে, শ্রদ্ধেয় উসতাযের কথাগুলো আমাদের পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনা দরকার। হতে পারে তিনি ইসলামের এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবহিত হয়েছেন, ঘটনাচক্রে যার সঙ্গে জামে' আযহারের কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ একজন মুসলমান হিসেবে তা আমাদের জানা দরকার।

সেমতে তিনি তার অধ্যাপনা শুরু করলেন। প্রথমে তিনি আমাদেরকে সুন্নাহর ইতিহাস বিষয়ে পড়াতে শুরু করলেন। আসলে তিনি যা পড়াতেন তা ছিলো তার সামনে রাখা একটি বিশাল গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র। পরবর্তীকালে জানতে পেরেছি যে, সামনের সেই গ্রন্থটি হচ্ছে গোল্ড যেহেরের আলোচিত বই دراسات إسلامية [দিরাসাতুন ইসলামিয়্যাহ]।

আমাদের শিক্ষক ডক্টর আলী হাসান আবদুল কাদের সাহেব সেই গ্রন্থটি থেকে বিভিন্ন কথা নকল করতেন আর আমাদেরকে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করতেন যে, এটাই জ্ঞানগত নিগুঢ় তত্ত্ব।

প্রায়দিন তার সঙ্গে আমাদের তর্ক বেঁধে যেতো। একদিকে তিনি পড়াতেন, অন্যদিকে আমাদের মতো ছাত্রদের কাছে যে বিষয়টি অশুদ্ধ মনে হতো, তা

Scanned by CamScanner

নিয়ে আমাদের যুক্তি-পাল্টা যুক্তি চালাচালি শুরু হয়ে যেতো। কিন্তু তার অভ্যাস হলো, তিনি কখনই সেই বইয়ের ভেতর আলোচিত কোনো তথ্য বা কোনো বিষয়ে গোল্ড যেহেরের বিরুদ্ধাচরণ করতে রাজি হতেন না।

এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকলো। এক পর্যায়ে এক দিন তিনি ইমাম যুহরী রহ: কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি ইমামের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করলেন যে, তিনি উমাইয়া শাসকদের স্বার্থে জাল হাদীস তৈরি করতেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম। ইমাম যুহরী রহ. সম্পর্কে আমি আমার অল্প-বিস্তর জ্ঞানের আলোকে এ কথা প্রমাণিত করার চেষ্টা করলাম যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রের প্রবাদপ্রতীম ইমাম ছিলেন। উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন।

ডক্টর সাহেবের সঙ্গে আমার লম্বা তর্ক চললো; কিন্তু তিনি কিছুতেই তার নিজস্ব অভিমত প্রত্যাহার করলেন না। আমার রক্তে তখন চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেলো। আমি নিবেদন করলাম— 'ইমাম যুহরী সম্পর্কে গোল্ড যেহের যা বলেছেন, তার পুরোটাই আপনি অনুবাদ করে লিখে দিন।'

আমার নিবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি তথ্যগুলো নিজ হাতে দু' পাতায় লিখে দিলেন।

এরপর শুরু হলো আমার অনুসন্ধান অভিযান। ইমাম যুহরী রহ.-এর জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁর ওপর এই প্রাচ্যবিদের আরোপিত অভিযোগের সত্যাসত্য যাচাই করার জন্যে সাধারণ লাইব্রেরিগুলো চষে বেড়াতে লাগলাম। এমনকি জামে' আযহারের গ্রন্থাগারগুলোতে ইমাম যুহরী রহ. সম্পর্কে যতোগুলো হাতে লেখা অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি ছিলো, বা দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা চষে তাঁর যতোগুলো জীবনালেখ্য পেয়েছি, তার সবগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। এভাবে ইমাম যুহরী রহ. সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করলাম।

এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে আমার পূর্ণ তিন মাস কেটে গেলো। প্রতিদিন আমি শরীয়াহ অনুষদের ক্লাস শেষ হতেই তথ্য সংগ্রহের কাজে নেমে পড়তাম। শেষ রাত পর্যন্ত আমার গবেষণা চলতো। নিরন্তর গবেষণার ফলে আমার হাতে প্রচুর সত্য তথ্য একত্র হলো। আমি তখন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর আবদুল কাদের সাহেবকে বললাম, 'আমি মনে করি, গোল্ড

Scanned by CamScanner

যেহের ইমাম যুহরী রহ.-এর ক্ষেত্রে قدماء তথা প্রাচীন আমলের পণ্ডিতদের কথাগুলো বিকৃত করেছেন।'

তিনি আমার কথা নাকচ করে বললেন— 'এমনটা হতেই পারে না। কারণ, প্রাচ্যবিদরা অত্যন্ত নীতিবান হয়ে থাকেন। বিশেষত গোল্ড যেহের একজন সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানবন্ধু প্রকৃতির মানুষ। এ জাতীয় ব্যক্তিরা কখনই কারো কোনো কথা বা মন্তব্যে হেরফের বা বিকৃতি করতে পারেন না।'

আমি তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, এ প্রসঙ্গে একটি লেকচার পেশ করবো। লেকচার প্রদানের জন্যে পুরাতন সরায়ে আবিদীন সংলগ্ন جمعية الهداية الإسلامية। [জমইয়্যাতুল হিদায়াতিল ইসলামিয়া] এর সেমিনার কক্ষ নির্বাচন করলাম। জমইয়্যাহ কর্তৃপক্ষ সেই লেকচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্যে জামে' আযহারের ছাত্র-শিক্ষকদের কাছে দাওয়াতপত্র প্রেরণ করলো।

লেকচার উপস্থাপনের দিন সেমিনারকক্ষে প্রচুর ছাত্র-শিক্ষক সমবেত হলো। উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর মাঝে আমাদের উসতায ডক্টর আবদুল কাদের সাহেবও ছিলেন। আমি মনে-প্রাণে প্রত্যাশা করছিলাম যে, ডক্টর সাহেব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করুন এবং আমার আলোচনার ওপর তাঁর অভিমত পেশ করুন। তাকে পেয়ে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি এবং অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি।

আমার আলোচনার প্রতিপাদ্য ছিলো, ইমাম যুহরী সম্পর্কে গোল্ড যেহের যা লিখেছেন, তার বাস্তবতা উদ্‌ঘাটন করা। ডক্টর সাহেব আমার আলোচনা আদ্যোপান্ত শুনেছেন। আমি আমার আলোচনা শেষ করেছি এ কথা বলে যে— 'এটাই ইমাম যুহরী সম্পর্কে আমার অভিমত। তাঁর সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম ঠিক এমন ধারণাই পোষণ করেন। কাজেই আমি শ্রদ্ধেয় উসতায ডক্টর আবদুল কাদের সাহেবকে আহ্বান করছি যে, এ বিষয়ে তাঁর যদি কোনো আপত্তি থাকে, বা আমার আলোচনার ওপর তিনি যদি পরিতৃপ্তি বোধ না করেন তাহলে তিনি যেন তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে আমাদের বাধিত করেন'।

আমার আহ্বানে ডক্টর সাহেব নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং সর্বজন শ্রুত পরিষ্কার কণ্ঠে বলেন— 'আমি এ কথা স্বীকার করছি যে, আমি পূর্বে যুহরী সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম। এখন তাঁর সম্পর্কে আমি সম্যকরূপে

Scanned by CamScanner

অবহিত হয়েছি। আজকের সেমিনারে উপস্থাপিত বক্তব্যের ওপর আমার কোনো আপত্তি নেই।' তার এ বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

অনুষ্ঠান শেষে আমি جمعية الهداية الإسلامية [জমইয়্যাতুল হিদায়াতিল ইসলামিয়া] এর পরিচালক সাইয়্যেদ খিযির হুসাইন রহ.-এর কক্ষে প্রবেশ করি। পরবর্তীকালে তিনি আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেছিলেন। তার সামনেই শ্রদ্ধেয় উসতায ডক্টর আবদুল কাদের সাহেব আমাকে বলেন— 'তোমার এই আলোচনা প্রাচ্যবিদদের ব্যাপারে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। আমি চাচ্ছি, তুমি তোমার এই আলোচনার একটি অনুলিপি আমাকে দাও। আমি তা জার্মানিতে পাঠাবো। সেখানকার বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় ওরিয়েন্টালিস্টদের গবেষণা ও আলোচনা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে। আমি মনে করি, তোমার এই প্রবন্ধ ওরিয়েন্টালিস্ট মহলে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করবে।' আমি শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের এই প্রস্তাবনার ওপর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। সত্যি বলতে কী, আমি সেসময় মনে করেছিলাম, একজন স্নেহপরবশ শিক্ষকের ভূমিকা থেকে তিনি প্রিয় শিষ্যকে উৎসাহ যোগাতেই কথাগুলো বলেছিলেন।

এর কিছু দিন পর তিনি আমাকে তার বাসায় সাক্ষাত করতে বলেন। আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে বাসভবনে উপস্থিত হই। দীর্ঘ আলাপের পর আমরা একমত হই যে, এই গ্রীষ্মের ভেতর আমরা গোল্ড যেহেরের বইটির অনুবাদ করবো এবং তার সঙ্গে তার আপত্তিকর বিষয়গুলোর খণ্ডন যুক্ত করবো। কিন্তু এর পরপরই ইংরেজ সেনা দফতরের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুচনালগ্নে আমাকে কায়রোতে গ্রেফতার করা হয়। যার ফলে পরবর্তী ৭ বছর আর এ কাজটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারিনি। ওই সময় ডক্টর আবদুল কাদের তার نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। বইটির কথা আমি জানতে পারি প্রকাশের তিন বছর পর, যখন আমাকে শেষ বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এটি হলো ডক্টর আলী হাসান আবদুল কাদেরের সঙ্গে আমার সংঘটিত ঘটনা। আমি মনে করি– প্রাচ্যবিদ, বিশেষত গোল্ড যেহের সম্পর্কে তিনি তার পূর্বের অভিমত প্রত্যাহার করেছেন। গোল্ড যেহেরকে ইতোপূর্বে তিনি

Scanned by CamScanner

যেভাবে সত্যনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত ও উদ্ধৃতি নকলের ক্ষেত্রে শতভাগ বিকৃতিমুক্ত মনে করতেন, সেই ধারণা থেকেও তিনি সরে এসেছেন।

এটি হলো এক পক্ষের কথা। যারা প্রাচ্যবিদদের অন্ধ ভক্ত। যারা তাদের যে কোনো গবেষণা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। এর বিপরীতে আমাদের মাঝে আরেকটি দল আছে, যারা প্রাচ্যবিদদের ঘোরতর শত্রু। বিশেষত তাদের সাম্প্রদায়িকতাপ্রসূত স্বার্থপর চিন্তা-ভাবনার প্রচণ্ড বিরোধী। এ দলটির প্রতিনিধিত্ব করছেন আহমদ ফারেস আশ-শিদয়াক। তিনি তার বই ذيل الفرياق এর মাঝে লিখেছেন,

> إن هؤلاء الأساتيذ (المستشرقين) لم يأخذوا العلم عن شيوخه، وإنما تطفلوا عليه تطفلا، وتوثبوا فيه توثبا، ومن تخرج فيه بشيء فإنما تخرج على القسس، ثم أدخل رأسه في أضغاث أحلام، أو أدخل أضغاث أحلام في رأسه، وتوهم أنه يعرف شيئا وهو يجهله، وكل منهم إذا درس في إحدى لغات الشرق أو ترجم شيئا منها تراه يخبط فيها خبط عشواء، فما اشتبه عليه منها رقعه من عنده بما شاء، وما كان بين الشبهة واليقين حدس فيه وخمّن فرجّح منه المرجوح، وفضّل المفضول.
>
> এই শিক্ষকরা (প্রাচ্যবিদরা) মাশায়েখ থেকে ইলম অর্জন করেনি। বরং তারা শিশুসুলভ মানসিকতা নিয়ে ইলমের জগতে অনাহুতভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। তাদের মধ্য হতে যে বা যারাই কিছু ইলম অর্জন করেছে, বাস্তবতা হলো, তারা তা অর্জন করেছে তাদের পাদ্রীদের কাছ থেকে। যারা তাদের মস্তিষ্কের ভেতর উদ্ভট কথাবার্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে। অথবা তারা নিজেরাই নিজেদের মন-মস্তিষ্কে অবান্তর চিন্তাধারা জায়গা দিয়েছে।
>
> যার ফলে এখন সে নিজেকে বড্ড জ্ঞানী মনে করছে; অথচ বাস্তবতা হলো, সে ইলমশূন্য মূর্খ।
>
> আপনি হয়তো দেখে থাকবেন যে, তাদের কেউ যখন ইউরোপের কোনো ভাষা পড়ে বা সেখান থেকে কোনো কিছু অনুবাদ করে তখন অন্ধ উষ্ট্রীর মতো নর্তন-কুর্দন শুরু করে

Scanned by CamScanner

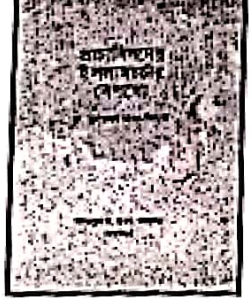
দেয়। তাদের কোনো প্রসঙ্গ তার কাছে অস্পষ্ট ঠেকলে সে নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া পট্টির আশ্রয় নিয়ে স্বকল্পিত ব্যাখ্যা প্রদান করে। আর যখন তাদের কোনো বিষয় নিয়ে সে সন্দেহ ও বিশ্বাসের দোলাচালে ভোগে তখন সেখানে ঘোড়ার মতো ছুটতে শুরু করে। দৌড়ের ওপর নাভিশ্বাস ফেলা এ লোকটি তখন ন্যায্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। যার ফলে সে প্রত্যাখ্যাত বক্তব্যকে প্রনিধান দেয়। আর প্রনিধানযোগ্য বক্তব্য এড়িয়ে যায়।'

আসলে এ দু' দলের কেউই বাস্তববাদী নয়। প্রাচ্যবিদরা তাদের নিরন্তর গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে যে-সব কীর্তি স্থাপন করেছেন, সেগুলোর ক্ষেত্রে নিঃশর্ত প্রশংসা ও নিরঙ্কুশ সমালোচনার কোনোটাই সঠিক নয়। আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের ধর্ম। ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে, আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রেখে চলবো। আপন-পর নির্বিশেষে সবার সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবো। সেমতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো। এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। [সূরা মায়েদা : ৮]

Scanned by CamScanner



ইসতিশরাক তথা প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস

ইতিহাস এক্ষেত্রে নীরব যে, ঠিক কবে কোন ইউরোপিয়ান প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞান-বিদ্যার ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন? যার কারণে সন-তারিখ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলার উপায় নেই। তবে এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, যখন মুসলিম অধ্যুষিত উন্দুলুসের সোনালি সময় চলছিলো, তখন সেখানকার মাদরাসাগুলোতে পশ্চিমা পাদ্রীরাও পড়াশুনা করতো। এদের মাধ্যমেই বিভিন্ন আরবি গ্রন্থ, বিশেষত কুরআন কারীম বিভিন্ন পশ্চিমা ভাষায় অনূদিত হয়। তারা মুসলিম উলামা ও পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিভিন্ন জ্ঞান আহরণ করে। বিশেষত ফিলোসফি, চিকিৎসা ও গণিত শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করে।

ইতিহাস খুঁজে যে সব পাদ্রীদের নাম জানা যায়, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে আসে ফরাসি পাদ্রী জারবার্ট (Jerbert) এর নাম। যিনি উন্দুলুসের বিভিন্ন মাদরাসায় পড়াশুনা করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কিছু দিন পর ৯৯৯ ঈসাব্দে রোমের প্রধান পোপ মনোনীত হন। এই তালিকার আরও দুটি নাম হচ্ছে– পিরেল অনার (Piérrele Aénéré) [১০৯২-১১৫৬ ঈ.] ও জেরার্ড ডি গ্রেমোনি (Gérard de Grémone) [১১১৪-১১৮৭ ঈ.]।

এই পাদ্রীরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর সেখানে আরবদের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রথিতযশা আলেমদের রচনাবলি ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে দেয়। এমনকি তারা আরবি জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্যে দেশজুড়ে অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে। এমনই একটি মাদরাসার নাম بادري [বাদাভি]। গির্জাগুলোতে, বা পাদ্রীদের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোতে আরবি থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত বই-পুস্তক পড়ানো হতো। ওই সময় ল্যাটিন ভাষা গোটা ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ভাষা হিসেবে বিবেচিত হতো। পশ্চিমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় ছয়শ বছর আরবদের রচনাবলির ওপর নির্ভরশীল

Scanned by CamScanner

ছিলো। পঠন ও পাঠদানের ক্ষেত্রে তারা আরবদের বইগুলোকেই উৎসগ্রন্থ বিবেচনা করতো।

তখন থেকেই শুরু হয় পশ্চিমাদের ইসলাম ও আরবি ভাষা চর্চা। এরপর থেকে সর্বযুগেই ইউরোপে এমন একদল মানুষ বিরাজ করতো, যারা নিয়মিত ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করে যাচ্ছে। তারা আরবি ভাষায় রচিত শিল্প, সাহিত্য সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক, নিদেনপক্ষে কুরআন কারীমের অনুবাদ করছে। এই ধারাবাহিকতা ঈসায়ি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে শুরু হয় পশ্চিম কর্তৃক মুসলিম জাহানের ওপর সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের নতুন পর্ব। এতোদিন যারা আরবদের অধীন হয়ে ছিলো, এখন তারাই মুসলিম জাহানের ওপর শাসনের ছড়ি ঘোরাচ্ছে।

এ সময় ইউরোপের বুকে জন্ম নেয় এমন একদল বিশেষজ্ঞ, যারা ইসতিশরাকের ময়দানে গভীর বুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলো। এ উদ্দেশ্য পূরণে পশ্চিমা দেশগুলোতে শুরু হয়ে যায় একের পর এক পত্রিকা প্রকাশনা। পত্রিকাগুলোতে প্রাচ্যবিদরা আরবের বিভিন্ন দেশ ছাড়াও মুসলিম জাহানের বিভিন্ন আরবি পাণ্ডুলিপির ওপর আক্রমণ শানাতো। দুর্ভাগ্যক্রমে ওই যুগে পাণ্ডুলিপিগুলোর মালিকানা ছিলো এমন কিছু গণ্ডমূর্খের হাতে, যারা সেগুলোর মূল্যমান জানতো না। পশ্চিমারা সেগুলো তাদের হাত থেকে কিনে নিতো। কিছু পাণ্ডুলিপি ছিলো সে যুগের পাবলিক লাইব্রেরিগুলোতে। চরম অব্যবস্থাপনা ও অরাজকতার কারণে অতীব মূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষিত ছিলো না। এ সুযোগে পশ্চিমারা সেগুলো চুরি করে তাদের দেশে নিয়ে যায়। এভাবে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি আরবদের হাতছাড়া হয়ে চলে যায় ইউরোপের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে এমন পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিলো ২ লক্ষ ৫০ হাজার। যেই সংখ্যা সময়ের সাথে সাথে প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ১৮৭৩ সালে মুসতাশরিকদের প্রথম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় প্যারিসে। এরপর থেকে নিয়মিত এ ধরনের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কনফারেন্সগুলোতে তারা প্রাচ্যের বিভিন্ন জ্ঞান, ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর তাদের অভিমত উপস্থাপন করে থাকে। এ জাতীয় কনফারেন্স এখনও অনুষ্ঠিত হয়।

Scanned by CamScanner



প্রাচ্যতত্ত্বের কর্মক্ষেত্র

আমরা দেখতে পেয়েছি, ইসতিশরাক সূচিত হয়েছে ইসলাম ও আরবি ভাষা শেখার মাধ্যমে। এই পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে প্রাচ্যের ওপর পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের পর। তখন শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব। এ পর্বে এসে তারা প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্ম, প্রথা, প্রচলন, শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জিওগ্রাফি, মূল্যবোধ ও স্থানীয় বিভিন্ন ভাষার ওপর গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা শুরু করে দেয়।

তবে তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিলো ইসলাম ধর্ম, ইসলামি মূল্যবোধ ও আরবি সাহিত্য। এর ওপরই তারা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ, এর নেপথ্যে ছিলো তাদের ধর্মীয় চেতনা ও রাজনৈতিক স্বার্থ। যা তাদেরকে সর্বোতভাবে প্রাচ্যের ওপর অধ্যয়ন করতে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে। আমি বিষয়টির ওপর যথাস্থানে বিশদভাবে আলোচনা করবো।

Scanned by CamScanner



প্রাচ্যতত্ত্ব উদ্ভবের নেপথ্য কারণসমূহ

১. ধর্মীয় চেতনা

পশ্চিমাদের মাঝে প্রাচ্য সম্পর্কে অধ্যয়নের নেপথ্যে যে কারণটি সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে, তা হলো তাদের ধর্মীয় চেতনা। আমি মনে করি, বিষয়টি প্রমাণিত করতে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হবে না এবং একের পর এক যুক্তি পেশ করে তার আলোকে ফলাফল বের করার কসরতও দেখাতে হবে না। কারণ, আমরা ইতোপূর্বে পরিষ্কার দেখেছি যে, এই ইসতিশরাক সূচিত হয়েছে খ্রিস্টান পাদ্রীদের মাধ্যমে। বর্তমান যুগেও তাদের সেই কসরত চলছে, যেমনটি আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি।

তাদের প্রধান লক্ষ্যই হলো, ইসলামের ওপর অভিযোগের স্তূপ ঢেলে দেওয়া, ইসলামের সৌন্দর্যের ওপর কালিমা লেপন করা এবং ইসলামের মূলনীতি ও বাস্তবতা বিকৃত করা। এটিকে তারা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে। এই পাদ্রীরা বেশ ভালোভাবেই জানে– ইসলামই খ্রিস্টধর্মের প্রধান ও একক প্রতিপক্ষ। যার কারণে তারা মনে করে– এই জনগণ — যাদেরকে তারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে— তাদেরকে যে কোনো মূল্যে এ কথা বোঝাতে হবে যে, 'ইসলাম এমন এক ধর্ম, যা প্রসার ও বিস্তারের যোগ্যতা রাখে না। আর মুসলমানরা হলো খুনী, চোর ও অশ্লীল বাক্যালাপে অভ্যস্ত জাতি। তাদের ধর্ম সবসময় তাদেরকে শারীরিক স্বাদ আস্বাদনের মাঝে ডুবিয়ে রাখে। কোনো ধরনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও নৈতিক উৎকর্ষতার সুযোগ দেয় না।'

এরপর যখন তারা দেখতে পেলো যে, আধুনিক সভ্যতা পশ্চিমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের শেকড় নড়বড়ে করে ফেলেছে। ইতোপূর্বে জনগণ খ্রিস্টান

Scanned by CamScanner

ধর্মব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যেসব বিদ্যা অর্জন করেছে, সেগুলো এখন তাদের চোখে প্রশ্নবিদ্ধ হতে শুরু করেছে। তখন তারা অনুভব করলো যে, জনগণের দৃষ্টি ঘোরাতে হলে সর্বাগ্রে ইসলামের ওপর আক্রমণ করতে হবে। যদি ইসলাম ধর্ম ও ইসলামি শিক্ষার ওপর আক্রমণের নতুন ফ্রন্ট খোলা যায় তাহলে বর্তমানে খ্রিস্টধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মীয় গ্রন্থের ওপর জনগণের মনে যেই সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, তার মোড় ঘুরে যাবে।

পাদ্রীরা ভালো করেই জানতো যে, ইতিহাসের সূচনালগ্নে ইসলামের অব্যাহত বিজয়প্রবাহ, এরপর ক্রুসেড যুদ্ধ ও সবশেষে ইউরোপের বুকে উসমানি খেলাফতের একের পর এক বিজয়ের কারণে ইউরোপবাসীদের মনে ইসলামি শক্তি সম্পর্কে ভীষণ ভয় ও মুসলমানদের ব্যাপারে প্রচণ্ড বিরক্তি জন্ম দিয়েছে। এভাবেই তারা ওই সময়ের এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। এ বিষয়টিই তাদেরকে নানা ইসলামি বিষয় সম্পর্কে অধ্যয়নের ওপর গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রাচ্য সম্পর্কে তাদের অধ্যয়নের নেপথ্যে এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। এর পাশাপাশি আরেকটি কারণ এখানে বড় ভূমিকা পালন করেছে। আর তা হলো, তাদের মিশনারী মনোবৃত্তি। যা তারা তাদের গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডে এক মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হয়নি। কারণ, সর্বাগ্রে তাদের পরিচয় তারা নিজ ধর্মের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ ঠিকাদার। তাইতো দেখা যায়, তারা ইসলামের শুভ্র বদনে কালিমা লেপন করাকেই তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য বানিয়েছিলো। মুসলমানদের মনে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বিদঘুটে চেহারায় উপস্থাপন করার প্রতিটি সুযোগ তারা কাজে লাগিয়েছে। ইসলামের ধর্মবিশ্বাসের মাঝে সন্দেহের ইঁদুর ঢুকিয়ে দিয়েছে। ইসলামি ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের মাঝে সংশয়ের বীজ বপন করেছে। শুধু এতোটুকুনই নয়; জ্ঞান, সাহিত্য, উত্তরাধিকারের যে বিষয়গুলো ইসলামের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত, সেগুলোকেও বিশ্ববাসীর সামনে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলার সর্বত প্রয়াস চালিয়েছে।

২. সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা

যদিও ক্রুসেড যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিলো খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের পরাজয়ের মাধ্যমে। এই ক্রুসেড যদিও বাহ্যিকভাবে ছিলো ধর্মের জন্যে

Scanned by CamScanner

যুদ্ধ; কিন্তু আদতে সেটি ছিলো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এমন শোচনীয় পরাজয় সত্ত্বেও পশ্চিমারা থেমে যায়নি। তারা এক মুহূর্তের জন্যেও তাদের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা থেকে নিরাশ হয়নি। প্রথমে আরব দেশসমূহ, এরপর সমগ্র মুসলিম জাহান দখল করার অভিলাষ ইউরোপিয়ানদের মনে সবসময় জাগ্রত ছিলো। যার কারণে তারা তাদের মনোযোগের বাঁক ঘুরিয়ে দিলো অন্যদিকে। ঢাল-তরবারি রেখে তারা এই দেশগুলো সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন শুরু করে দিলো। এখানকার বিশ্বাস, মূল্যবোধ, প্রাত্যহিক অভ্যাস, নৈতিকতা, সম্পদ, প্রাচূর্য্য তথা সব ধরনের তথ্য সংগ্রহের কাজে নেমে পড়লো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, প্রথমে তারা মুসলিম বিশ্বের শক্তির উৎসগুলো সম্পর্কে অবহিত হবে। এরপর তারা সেগুলো দুর্বল করার মিশনে নামবে। আর তারা এ কথা জানে যে, প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার সবচেয়ে সহজ পথ তাকে দুর্বল করা। দুর্বল প্রতিপক্ষকে সহজেই হাতিয়ে নেওয়া যায়।

যখন পশ্চিমাদের সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বত্র তাদের রাজনৈতিক আধিপত্যের বিস্তার ঘটে। এর ফলে ইসতিশরাকি চক্র মুসলমানদের প্রতিরোধ স্পৃহা নিঃশেষ করার সুযোগ পেয়ে যায়। আধ্যাত্মিক ও মনোজাগতিক– দু'ভাবেই তারা আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করতে থাকে। আমাদের চিন্তাধারার মাঝে সন্দেহ ও সংশয়ের ঘুণে পোকা ধরিয়ে দেয়। তাদের প্রবিষ্ট সংশয়ের কারণে আমাদের বিশ্বাস ভাঙ্গতে শুরু করে। আমাদের উত্তরাধিকারের দেয়ালে চিড় ধরে যায়। আমাদের মানবিক মূল্যবোধে ধস নেমে আসে। যার অনিবার্য পরিণতিতে আমরা হারিয়ে ফেলি আমাদের অমূল্য আত্মবিশ্বাস। নিঃস্ব পথিকের মতো আমরা হাত বাড়াতে শুরু করি পশ্চিমা সভ্যতার কাছে। এখন আমরা এতটাই পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছি যে, আমাদের অবস্থা হলো— নৈতিকতার মাপকাঠি শিখতে চাও? পশ্চিমাদের কাছে হাত পাতো। বিশ্বাসের বুনিয়াদ জানতে চাও? পশ্চিমাদের কাছ থেকে জেনে নাও।

এভাবে পশ্চিমারা তাদের পরিকল্পনাগুলো একের পর এক বাস্তবায়ন করেছে। তারা এটাই চেয়েছে যে, আমরা যেন তাদের কৃষ্টি-কালচারের পুরোপুরি অনুগত হয়ে পড়ি। তাহলে আর কোনো দিন আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবো না।

Scanned by CamScanner

আপনি লক্ষ্য করুন, কীভাবে তারা আমাদের দেশে প্রাচীন আমলের জাতিয়তাবাদ নতুন করে উস্কে দিচ্ছে। অথচ হাজার বছর আগেই তা আমাদের এতদাঞ্চল থেকে মুছে গিয়েছিলো। আরবদের মাঝে ইসলামের আলো ফোঁটার সাথে সাথেই জাতিয়তাবাদের মৃত্যু ঘটেছিলো। ইসলামের সাম্যবাদের মহান বার্তা শতধাবিচ্ছিন্ন আরবদেরকে এক প্লাটফর্মে নিয়ে এসেছিলো। ইসলামের ছোঁয়া পেয়ে গোটা আরব এমনভাবে বদলে গিয়েছিলো যে, এখন তাদের ভাষা এক। ধর্মবিশ্বাসও এক। জন্মভূমিও এক।

আরবরা ইসলামের এই সুমহান বার্তা বহন করে নিয়ে যায় গোটা বিশ্বের কাছে। এই ইসলামের কল্যাণে পৃথিবীর অপরাপর জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে আরবদের গড়ে ওঠে মানবিক প্রগাঢ় সম্পর্ক। এই সম্পর্ক যতোটাই মানবিক, ততোটাই ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক। যেই সম্পর্কের ফলে একদিকে আরবরা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায় পেয়ে যায় সঠিক পথের দিশা। লাভ করে হিদায়াতের অবিনাশী আলো। উন্নীত হয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অনন্য আসনে।

বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে পশ্চিমারা আমাদের ওপর জাতীয়তাবাদের ভূত চাপিয়ে দিচ্ছে। মিসরে ফিরআউনিয়তের উন্মেষ ঘটাচ্ছে। সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিনে فينيقيت তথা ফেনোশিয়ান (phoenicion) মতবাদ উগড়ে দিচ্ছে। ইরাকে এসোরিয়ান মতবাদের বিস্তার ঘটাচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে তারা খুব সহজেই আমাদের এক উম্মাহমুখী দৃষ্টিভঙ্গি মাটিচাপা দিতে পারবে। তখন আর আমাদের পক্ষে নতুন করে সভ্যতা-সংস্কৃতির নেতৃত্বভার তুলে নেওয়া সম্ভব হবে না। আমরা আর নিজেদের অভিন্ন স্বার্থ, একক ইতিহাস, উন্নত নৈতিকতা, ঈর্ষণীয় মূল্যবোধ ও অদ্বৈত বিশ্বাসের সূত্রে এক প্লাটফর্মে সংঘবদ্ধ হতে পারবো না। বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার আরব্য শক্তি হারিয়ে যাবে মহাকালের গর্ভে।

৩. বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি

ইসতিশরাকের পালে হাওয়া যোগানোর ক্ষেত্রে যেই কারণগুলো সবচেয়ে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে, তার একটি হলো– আমাদের সঙ্গে পশ্চিমাদের

Scanned by CamScanner

ব্যবসা-বাণিজ্যের মুনাফা লোটার দূরভিসন্ধি। এর পেছনে তাদের অনেকগুলো স্বার্থ জড়িত রয়েছে।

১. তারা তাদের পণ্যগুলো ব্যাপক হারে আমাদের পকেটে গছিয়ে দিতে পারবে।

২. আমাদের প্রাকৃতিক কাঁচামাল অত্যন্ত সস্তামূল্যে কিনে নিতে পারবে।

৩. বিভিন্ন আরব দেশে, আরেকটু ব্যাপকাকারে বললে, মুসলিম জাহানের বিভিন্ন স্থানে যে-সব স্থানীয় উৎপাদনমুখী কল-কারখানা রয়েছে, সেগুলোকে নিঃশব্দে গলা টিপে হত্যা করতে পারবে।

৪. রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি

পশ্চিমাদের মনে বাণিজ্যিক স্বার্থোদ্ধারের পাশাপাশি আরেকটি নেপথ্য কারণও রয়েছে। যেহেতু বর্তমান যুগে অধিকাংশ আরবদেশ ও মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেহেতু ওই কারণ এখন পরিস্কার পরিদৃষ্ট হচ্ছে। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, আরব দেশগুলোতে ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলোর যে-কটি এম্বেসি রয়েছে, প্রতিটি এম্বেসিতে 'সংস্কৃতি বিভাগ' নামে একটি শাখা আছে। অথবা ন্যূনতম একজন সচিব রয়েছে, যিনি খুব ভালোভাবে আরবি ভাষা বলতে পারেন। আরবি ভাষা সম্পর্কে যার গভীর জ্ঞান রয়েছে। তার দায়িত্ব হলো, সে স্থানীয় সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি ও সুশীল সমাজের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবে। তাদের চিন্তা-ভাবনার গতি-প্রকৃতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে। তাদের মাঝে ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থানুসারে রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেবে।

আমরা অতীতে এই পারস্পরিক যোগাযোগ ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রসারের ভয়াবহ পরিণতি দেখেছি। অতীতের ধারাবাহিকতায় এই পশ্চিমা কূটনীতিবিদরা এখনও বেশ কিছু আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে এই মিশন বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তারা পারস্পরিক সহায়তা ও কল্যাণকামিতার নামে এমন কিছু কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, যা আদতে মুসলিম দেশগুলোর একটিকে অন্যটির বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে। তারা আরব দেশগুলোর পরস্পরে অনৈক্য ও বৈরীতার জাল বিস্তার করছে।

Scanned by CamScanner

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, তারা এতদাঞ্চলের রাষ্ট্রপ্রধানদের মন-মানসিকতার ওপর খুব ভালো ভাবে পড়াশুনা করেছে। তারা পরিষ্কারভাবে জানে যে, এই ভূখণ্ডের গণরাজনীতির দুর্বলতা কোথায়। এমনকি তারা এ কথাও জানে যে, সাধারণ জনগণের মন-মানসিকতা সবসময় তাদের স্বার্থপরিপন্থী। তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার ঘোরতর শত্রু।

৫. বুদ্ধিবৃত্তিক ও গবেষণাপ্রসূত কারণ

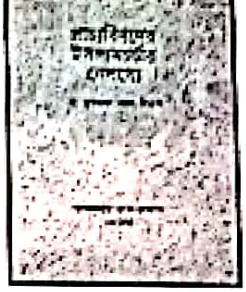
প্রাচ্যবিদদের মাঝে একটি ছোট্ট দল আছে, যারা প্রাচ্যের ওপর অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে স্রেফ বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ওপর তাদের মনের একান্ত কৌতূহল থেকে। অন্যদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মচর্চা ও ভাষা জানার আগ্রহই তাদেরকে ইসতিশরাকের পথে ডেকে এনেছে।

ইসলাম ও ইসলামি ঐতিহ্য বোঝার ক্ষেত্রে অপরাপর মুসতাশরিকের তুলনায় এ দলটির ভুল অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কেননা তারা কখনই ইচ্ছাকৃত প্রতারণা, অসততা ও বিকৃতি করতো না। যার কারণে দেখা যায়, তাদের গবেষণা ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলো হয়ে থাকে সিংহভাগ প্রাচ্যবিদের বিপরীতে সত্যনিষ্ঠ, বাস্তবতাশ্রিত ও জ্ঞানচর্চার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ। এমনকি এ দলটির কেউ কেউ পরবর্তী জীবনে ইসলামও গ্রহণ করেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের পয়গাম বোঝার অনুসন্ধিৎসু চেতনা তাদেরকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করেছে।

নিরীক্ষণ করে দেখেছি যে, প্রাচ্যবিদদের ছোট্ট এ দলটির অধিকাংশ সদস্যই এমন, যাদের আয়ের অন্য কোনো নিজস্ব উৎস আছে, বা ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। যার কারণে তারা নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে প্রাচ্যতত্ত্ব চর্চা করতে পেরেছেন।

যেহেতু এ দলটির প্রাচ্যতত্ত্ব চর্চার নেপথ্যে প্রবৃত্তির খায়েশ পূরণের অভিলিপ্সা ছিলো না, সে কারণে ইউরোপের সাধারণ বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিবিদ ও ধর্মব্যবসায়ী সমাজের কাছে তারা কখনই সমাদৃত হতে পারেনি। এই ইসতিশরাকচর্চা তাদের জন্যে কোনো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বয়ে আনতে পারেনি। এসব কারণে দেখা যায়, প্রাচ্যবিদদের বিশাল সমাজে এই পঞ্চম শ্রেণির মুসতাশরিকের সংখ্যা অপ্রতুল ও বিরল।

Scanned by CamScanner



প্রাচ্যতত্ত্বের দূরভিসন্ধি ও উপকরণ

মুসতাশরিক বা ওরিয়েন্টালিস্ট সোসাইটি কেন প্রাচ্য নিয়ে চর্চা করে, এর পেছনের উদ্দেশ্যগুলো নিরীক্ষণ করলে দেখা যায়, এখানে মোটামুটি তিন শ্রেণির উদ্দেশ্য রয়েছে—

ক. বুদ্ধিবৃত্তিক সন্দেহ বিস্তার

প্রথম লক্ষ্য হলো, জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সন্দেহ। ওরিয়েন্টালিস্ট সমাজ এ লক্ষ্যটি বাস্তবায়ন করে পাঁচভাবে—

১. নবী করীম সা.-এর নবুওয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা

অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরীত রাসূল– এ বিষয়টি সবার কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করা। আমরা নিরীক্ষণ করে দেখেছি, অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে স্বীকার করে না। তারা মানে না যে, তাঁর ওপর 'অহি' তথা আল্লাহর প্রত্যাদেশ অবতরণ করেছে।

নবীজির ওপর আসমানি 'অহি' অবতীর্ণ হওয়ার যেই ঘটনাগুলো অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন, বিশেষত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদি. —যিনি পাখির চোখে 'অহি' অবতরণের দৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ অবলোকন করেছেন— সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদরা অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়। তারা 'অন্ধকে হাইকোর্ট দেখানোর মতো' কোনোরকম গোঁজামিল দিয়ে বিষয়টি এড়ানোর চেষ্টা করে।

Scanned by CamScanner

তাদের অপব্যাখ্যার কিছু নমুনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যেমন, কিছু মুসতাশরিকের ভাষায় নবীজি ছিলেন মৃগীরোগে আক্রান্ত। নবীজির ওপর 'অহি' অবতীর্ণ হওয়াটা তাদের ভাষায় মৃগীরোগের প্রকাশ।

আরেকদল মুসতাশরিকের অভিমত হলো, 'অহি' বলে কোনো কিছু নেই। এগুলো নবীজির মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র। তিনি মাঝে মাঝেই এমন কল্পনা বিলাসের শিকার হতেন।

তৃতীয় আরেকটি দল 'অহি'কে নবীজির মানসিক রোগ হিসেবে অভিহিত করেছে।

সাহাবায়ে কেরাম প্রকাশ্য দিবালোকে 'অহি' অবতীর্ণ হওয়ার যেই দৃশ্যগুলো দেখেছেন, প্রাচ্যবিদ সমাজ সেগুলোর ব্যাপারে এমন উদ্ভট মন্তব্য করে পাশ কাটানোর চেষ্টা করে থাকে। তাদের এমন অদ্ভুত অপব্যাখ্যার বহর দেখলে মনে হয়, পৃথিবীর বুকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বপ্রথম নবী দাবী করেছেন। তাঁর পূর্বে আর কোনো নবী-রাসূল ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হননি। যার কারণে তাদেরকে এভাবে ঘুরিয়ে- পেঁচিয়ে ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হচ্ছে। অথচ এই মুসতাশরিকদের সিংহভাগই ইয়াহুদি বা খ্রিস্টান। তারা তাওরাতে আলোচিত নবী-রাসূলদের কথা স্বীকার করেন। প্রাচ্যবিদরা কীভাবে এ বাস্তবতা ভুলে গেলো যে, ঐতিহাসিক সত্যতা, মানবসমাজের ওপর প্রভাব এবং বুনিয়াদি দৃঢ়তার বিচারে তাওরাতে আলোচিত নবীগণ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ঢের পিছিয়ে। প্রাচ্যবিদরা তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও মানসিক বৈরীতার কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছে। এই সেই ধর্মীয় গোঁড়ামি- যার থেকে পশ্চিমা সমাজের কোনো পাদ্রী, ধর্ম ব্যবসায়ী ও মিশনারী নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি।

এ কথা পরিষ্কার যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত অস্বীকার করে, সে অবশ্যই এ কথা অস্বীকার করবে যে, কুরআন আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ আসমানি গ্রন্থ। তখন তাদের সামনে কেউ যদি এ প্রশ্ন তোলে যে, কুরআন যদি আসমানি গ্রন্থ না হয়ে থাকে তাহলে কীভাবে তার মাঝে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর খুঁটি-নাটি বিবরণ সম্বলিত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে

Scanned by CamScanner

এসেছে! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো একজন নিরক্ষর ব্যক্তির নিজের পক্ষ থেকে সহস্র বছর আগে এমন ঐতিহাসিক তথ্য ব্যক্ত করা আদৌ সম্ভব নয়। এমন অকাট্য যুক্তির উত্তরে প্রাচ্যবিদরা ঠিক সেই উত্তরটাই দেয় যা নবীজির যুগে আরবের মুশরিকরা দিতো। তারা বলে—মুহাম্মদ (সা.) এই তথ্যগুলো এমন কারো কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন, যিনি প্রাগৈতিহাসিক যুগের যাবতীয় তথ্য জানতেন। এভাবে প্রাচ্যবিদরা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট বিষয়গুলোকে অন্ধের মতো উপেক্ষা করার ব্যর্থ কসরত করে থাকে।

এরপর যখন বর্তমান যুগে কুরআনের এমন কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, যা ইতোপূর্বে অন্য কোনো ভাবে মানুষের হাতে আসেনি। তখন আদতে প্রাচ্যবিদদের মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড় হয়। কিন্তু সেখানেও তারা এভাবে কূটতর্ক শুরু করে দেয় যে, আসলে ব্যক্তি মুহাম্মদ অত্যন্ত মেধাবী ও দূরদর্শী ছিলো, বলেই এতো আগে এমন নিগুঢ় তথ্য জানাতে পেরেছে। সন্দেহ নেই, তাদের এ সকল ঠুনকো উত্তর তাদের অপ্রস্তুত ও অপরিপক্ক বুদ্ধির প্রমাণ বহন করে।

২. ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত ধর্ম হওয়ার ওপর প্রশ্ন তোলা

প্রাচ্যবিদ মহলের যেই গোঁড়ামি শুরু হয়েছিলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত অস্বীকার করার মাধ্যমে, সেই অস্বীকারের অনিবার্য পরিণতিতে আরও অনেক কিছু অস্বীকারের ধারা চলে আসে। ইতোপূর্বে বলেছি যে, তারা কুরআন কারীমকে আসমানি গ্রন্থ স্বীকার করে না। তারই ধারাবাহিকতায় তারা ইসলামকে আল্লাহপ্রদত্ত ধর্ম স্বীকার করে না। তারা বলে, ইসলাম হলো ইয়াহুদিজম ও খ্রিস্টধর্মের সমন্বয়ে গঠিত একটি মানবরচিত ধর্ম। অথচ এতো বড় দাবীর স্বপক্ষে তাদের কাছে কোনো নির্ভরযোগ্য জ্ঞানজ প্রমাণ নেই। আলোচিত এ দু'টি ধর্মের সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ে ইসলামের মিল থাকাকেই তারা খোঁড়া যুক্তি হিসেবে দাঁড় করায়। কতোটা হাস্যকর তাদের এই যুক্তি!

আপনি শুনলে বিস্মিত হবেন, গোল্ড যেহেরের মতো ইয়াহুদি মুসতাশরিকও এ কথা প্রমাণিত করতে সীমাহীন লালায়িত যে, ইসলাম ধর্ম গঠিত হয়েছে

Scanned by CamScanner

ইয়াহুদি ধর্ম থেকে আহরিত হয়ে এবং ইসলাম বিভিন্নভাবে ইয়াহুদিজম থেকে প্রভাবিত। এমনকি খ্রিস্টান মুসতাশরিকদেরকেও ওই দাবীর প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে ইয়াহুদি মুসতাশরিকদের পেছন পেছন ছুটতে দেখা যায়। অথচ বাস্তবতা হলো, খ্রিস্টধর্মের কাছে এমন কোনো শরীয়ত নেই, যার ব্যাপারে তারা দাবী করতে পারবে যে, ইসলাম সেখান থেকে প্রভাবিত হয়েছে, বা সেখান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। খ্রিস্টধর্মের হাতে আছে অল্প কিছু নৈতিক মূলনীতি সম্বলিত শিক্ষা। এর বাইরে তা নিষ্কপর্দক।

এখন যদি তারা এ দাবী তোলে যে, ইসলাম গড়ে ওঠেছে খ্রিস্টধর্মের সেই গুটিকয়েক নৈতিক মূলনীতি সম্বলিত শিক্ষা থেকে এবং এগুলোই ইসলামের মূল নিয়ামক, তাহলে তাদের এ দাবীর অর্থ হলো, আপনাকে এ কথা মেনে নিতে হবে যে, আসমানি ধর্মগুলোর নৈতিকতার মূলনীতিগুলো পরস্পরে সীমাহীন সাংঘর্ষিক। অবস্থাদৃষ্টে মনে হবে, এই ধর্মের মূলনীতিগুলো এক স্রষ্টা দিয়েছেন। ওই ধর্মের মূলনীতিগুলো অন্য স্রষ্টা দিয়েছেন। হায়! হায়! কতোটা অবান্তর বক্তব্য! তাদের এমন অর্থহীন প্রলাপ থেকে মহান আল্লাহ অবশ্যই পবিত্র।

৩. হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত অস্বীকারের অনিবার্য পরিণতিতে তৃতীয়ত যে বিষয়টি চলে আসে তা হলো, হাদীসের বিশুদ্ধতা অস্বীকার করা। অথচ ইসলামের শুরু থেকে অদ্যাবধি সকল গবেষক উলামায়ে কেরাম হাদীসের বিশুদ্ধতার ওপর একমত। এক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদরা বিশেষ কিছু মহল কর্তৃক জাল হাদীস ও দুর্বল হাদীস তৈরির অপচেষ্টাকেই সবচেয়ে বড় দলীল হিসেবে পেশ করে। বিস্ময়ের বিষয় হলো, উলামায়ে কেরাম অসংখ্য সূক্ষ্ম মূলনীতির আলোকে যুগে যুগে জাল হাদীস ও মনগড়া বর্ণনার সংমিশ্রণ থেকে সহীহ-শুদ্ধ হাদীস যাচাই-বাছাই-ছাটাই করার যেই অনন্য কীর্তি স্থাপন করেছেন, তা বেমালুম এড়িয়ে যায়। অথচ বাস্তবতা হলো, ওই সকল প্রাচ্যবিদ নিজ ধর্মের যেসকল গ্রন্থকে 'পবিত্র গ্রন্থ' বিশ্বাস করে সেগুলোর শুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে হাদীস গবেষকদের অনুসৃত সতর্কতার এক দশমাংশও অবলম্বন করেনি। বিষয়টি নিয়ে আমি আমার

Scanned by CamScanner

সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي এর মাঝে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছি।

হাদীস সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের এমন উদ্ভট ধারণা ও ঠুনকো যুক্তির পেছনে কতোগুলো কারণ রয়েছে। তারা যখন দেখতে পেলো যে, হাদীস নামের এই সুবিশাল ভাণ্ডারে অসংখ্য অজস্র চৈন্তিক পুঁজি ও বিস্ময়কর সংবিধান রয়েছে। এর পাশাপাশি মুসলিম উলামায়ে কেরাম এই হাদীস শাস্ত্রের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। আর বিশুদ্ধ হাদীসের এই বিশাল ভাণ্ডার উৎসারিত হয়েছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। অথচ প্রাচ্যবিদরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে মানে না। এখন যদি এই হাদীসের এই বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারকে সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া হয় তাহলে তাদের অবিশ্বাসের দেয়াল খসে পড়বে।

এজন্যে তারা এ দাবী তুললো যে, মুহাম্মদের মতো একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে এতো বিপুল জ্ঞান বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। কাজেই এগুলো হলো প্রথম তিন শতাব্দীর মুসলমানদের সম্মিলিত অবদান।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত অস্বীকার করাটাই প্রাচ্যবিদদের সবচেয়ে বড় মনস্তাত্ত্বিক বিপদ। এই এক বিপদই তাদেরকে এ জাতীয় আরও অসংখ্য বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

৪. ইসলামি ফেকাহর নিজস্ব মূল্যমাণ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা

মুসলমানদের হাতে ইসলামি শরীয়ত নামে আইন ও সংবিধানের যেই বিপুল প্রাচূর্য রয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর হাতে তা নেই। মুসতাশরিক সমাজ জ্ঞানের এই বিশাল কর্মযজ্ঞ দেখে আক্ষরিক অর্থেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতবাক। কারণ, তারা তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে স্বীকার করে না। নিজেদের সেই অবিশ্বাস তত্ত্বকে বাঁচাতে তারা এখানে নতুন এক দাবীর আশ্রয় নিলো। তারা দাবী তুললো যে, এই সুবিশাল ফিকাহ ভাণ্ডার রোমানদের সামাজিক সংবিধান থেকে আহরিত। তাদের থেকে বিভিন্নভাবে সহায়তা নিয়েই মুসলমানরা ফিকাহ শাস্ত্র সংকলন করেছে।

Scanned by CamScanner

প্রাচ্যবিদদের এই অবান্তর দাবীর বিরুদ্ধে আমাদের গবেষক উলামায়ে কেরাম সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। প্রাচ্যবিদদের মুখে চুনকালি মেখে দিয়েছে সম্প্রতি লাহাই নগরীতে অনুষ্ঠিত 'সমকালীন আইন ও সংবিধান কনফারেন্স'। কনফারেন্স কর্তৃপক্ষ বিস্তর গবেষণা শেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, 'ইসলামি ফিকাহ একটি স্বতন্ত্র সংবিধান। পৃথিবীর অন্য কোনো সংবিধান থেকে আহরিত হয়ে তা গঠিত হয়নি।' তাদের এই ঘোষণার কারণে উগ্রপন্থীদের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। সত্যনিষ্ঠরা সেখান থেকে পেয়েছে পরম পরিতৃপ্তি।

৫. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপ্লব সফল করার ক্ষেত্রে আরবি ভাষার যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করা

প্রাচ্যবিদরা চেয়েছে, মুসলমানরা যেন তাদের পরিভাষার ভিখারি হয়, তারা যেন পশ্চিমাদের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় এবং নিজেরা নিজেদের ভাষা নিয়ে হীনম্মন্যতার শিকার হয়, এজন্যে তারা এ কথা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপ্লব সফল করার সক্ষমতা আরবি ভাষার নেই। তারা আরবি ভাষার হাজার বছরের উত্তরাধিকারকে একটি অনাবাদী, বন্ধ্যা ধূসর প্রান্তর প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছে।

নিঃসন্দেহে এটি প্রাচ্যবিদদের একটি সাহিত্যঘেষা সাম্রাজ্যবাদ– তারা তাদের সামরিক সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে এই সাহিত্যসংশ্লিষ্ট হাতিয়ার প্রয়োগ করেছে।

এই পাঁচটি লক্ষ্যই প্রাচ্যবিদদের জ্ঞানচর্চাগত মূল উদ্দেশ্য। এগুলো বাস্তবায়ন করতেই তারা দিন-রাত একাকার করে খেঁটে যাচ্ছে।

খ. ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি

প্রাচ্যবিদদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে কিছু কথা নিবেদন করতে চাইছি। তাদের দূরভিসন্ধি হলো–

১. মুসলমানদেরকে তাদের নবী, কুরআন, শরীয়ত ও ফিকাহ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ করে তোলা। সেগুলোর প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করা। এ কর্মসূচির পেছনে প্রাচ্যবিদদের ধর্মীয় ও সাম্রাজ্যবাদী– দু' ধরনের স্বার্থই রয়েছে।

Scanned by CamScanner

২. মুসলমানদের মনে তাদের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অনাস্থা সৃষ্টি করা। এজন্যেই তারা এ মিথ্যা জোরেশোরে ছড়ানোর চেষ্টা করে যে, মুসলমানদের সভ্যতা আদতে রোমানদের সভ্যতা থেকে আহরিত। আরব ও মুসলমানরা সেই সভ্যতা জন্ম দেয়নি; বরং রোমানদের কাছ থেকে ধার করে এনেছে মাত্র। মুসলমানদের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করে কোনো কিছু আবিষ্কার করার যোগ্যতা নেই। তাদের মাঝে সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা নেই। তাদের এই ধার করে আনা সভ্যতার মাঝেও সব ধরনের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে। এ কারণেই দেখা যায়, প্রাচ্যবিদরা যখন ইসলামি সভ্যতার কোনো সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা করে —যদিও এ ধরনের আলোচনা তারা কদাচিৎই করে— তখন তারা কোনোমতে দায়সারা গোছের কথা বলে, অসম্পূর্ণ আকারে, কোনোমতে ব্যক্ত করে সামনে এগিয়ে যায়।

৩. নিজেদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে মুসলমানদের মনোবল ভেঙে দেওয়া। উত্তরাধিকারসূত্রে তারা যেই ধর্মীয় মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও সোনালি আদর্শ পেয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে তাদের মনে নানাবিধ সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা। প্রাচ্যবিদরা এ ধরনের কাজগুলো এজন্যে করছে, যেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো মুসলমানদেরকে ভালোভাবে নিষ্পেষিত করতে পারে এবং তাদেরকে পশ্চিমাদের কৃষ্টি-কালচারের অনুগত দাস বানিয়ে নেয়। কেননা কোনো জাতিকে যদি একবার এ ধরনের দাসত্ববাদী মানসিকতার শিকারে পরিণত করা যায় তাহলে তার পক্ষে আর কোনো দিন সেই পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না। পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ-প্রেম তাদেরকে চিরকাল পাশ্চাত্যের সেবানুদাস বানিয়ে রাখবে।

৪. মুসলমানদের পারস্পরিক ঈমানি ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝে ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগের জাতীয়তাবাদ উস্কে দেওয়া। তাদের মাঝে পূর্বের জাতিগত বিদ্বেষ নতুন করে জাগিয়ে তোলা যায় তাহলে ইসলামকেন্দ্রিক তাদের ঐক্যের প্রাচীর ধসে পড়বে। আপনি খোলা চোখে সামান্য মনোনিবেশ করলে পরিষ্কার দেখতে পাবেন যে, গোটা উপসাগরীয় অঞ্চলে এমনটাই ঘটছে। আরবরা যেন কোনো দিন এক হতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে পশ্চিমারা প্রাণপণে খেটে যাচ্ছে। বিভেদ সৃষ্টির

Scanned by CamScanner

অসদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনে তারা ঐতিহাসিক নানা তত্ত্বের বিকৃতি করছে। ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন ঘটনার তিলকে তাল বানিয়ে নতুন প্রজন্মের সামনে মেলে ধরছে। প্রাচ্যবিদরা তাদের মাথার সবটুকু ঘিলু ব্যবহার করে এমন এক নতুন ইতিহাস উপস্থাপন করে চলেছে, যেই ইতিহাস আরবদের মাঝে বিভেদ ও অনৈক্যের কাঁটাতারের বেড়া তুলে রাখবে এবং ভবিষ্যতে আরবদেরকে নিজেদের জন্যে মঙ্গলকর কোনো সিদ্ধান্তে একমত হতে দেবে না।

গ. অজানাকে জানার কৌতূহল

এমন কিছু মুসতাশরিক আছেন, যাদের মনে প্রাচ্য সম্পর্কে অসংখ্য কৌতূহল রয়েছে। অজানাকে জানার আগ্রহ থেকেই তিনি ইসতিশরাকের ময়দানে এসেছেন। যিনি আরব ও ইসলামি ঐতিহ্য সম্পর্কে অধ্যয়ন করে নতুন নতুন তথ্য জানতে উদগ্রীব। এ জাতীয় প্রাচ্যবিদ সংখ্যায় নগণ্য।

যদিও প্রাচ্য সম্পর্কে চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তারা নিঃস্বার্থপর ও একনিষ্ঠ ছিলো; কিন্তু অধ্যয়নের ফলাফল উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে এরাও প্রচুর ভুল-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতার শিকার হয়েছে। তবে তাদের সেই ভুলের পেছনে কিছু অন্যরকম কারণ ছিলো।

সংক্ষেপে কারণগুলো তুলে ধরছি। যেমন, তাদের কেউ কেউ আরবি ভাষার গতি-প্রকৃতি ও ভাষাশৈলী সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলো না। কেউ হয়তো ইসলামের ইতিহাসের প্রাকৃত পরিবেশ ও চালচিত্রের কথা জানতো না। যার কারণে তারা আরবদের ইসলামি সমাজকে নিজেদের পরিবেশ ও সমাজের দর্পণে বুঝতে চেয়েছে। তারা বর্তমান সময়ে যেই পরিবেশে বড় হচ্ছে, সেই পরিবেশের সঙ্গে আরবদের ইসলামি সমাজের প্রাকৃতিক, মানসিক ও সময়কালের যে-সব গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, সেগুলো তাদের চোখে ধরা দেয়নি।

পশ্চিমা ওরিয়েন্টালিস্টদের আলোচিত তিনটি শ্রেণির মধ্যে এ শ্রেণিটিই নিজ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক অধিক নিরাপদ। তাদের কাছ থেকে আশঙ্কার পরিমাণও কম। কেননা এরা ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যবাদী চিন্তার লোক। যার কারণে দেখা যায়, তাদের সামনে

Scanned by CamScanner

সত্য প্রকাশ পেলে অতি দ্রুত তারা সত্য মেনে নেয়। তাদের কেউ কেউ প্রাচ্যচর্চার ক্ষেত্রে এতোটাই আন্তরিক যে, তারা মনে-প্রাণে নিজেকে সেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন, যেই পরিবেশ সম্পর্কে তিনি পড়ছেন। যার কারণে দেখা যায়, তাদের প্রাচ্যচর্চার পরিণতি অধিকাংশ সময় সত্যনিষ্ঠ ও বাস্তবানুগ ফলাফল বয়ে আনে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, বৃহত্তর ওরিয়েন্টালিস্ট সমাজ কখনই তাদেরকে সাদরে মেনে নেয় না। সত্যনিষ্ঠ হওয়ার কারণে তাদেরকে পদে পদে বৈরীতার সম্মুখীন হতে হয়। কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী তাদের এই প্রাচ্যচর্চাকে কখনও মানহীন গবেষণার দোষে দুষ্ট করে। কখনও তাদেরকে মুসলমানদের তোষামুদে বিশেষণে বিশেষায়িত করে। কখনও তাদেরকে 'মুসলমানদের নৈকট্যপ্রার্থী' তকমায় অভিহিত করে জনগণের কাছে অগৌণ করে তোলার চেষ্টা করে। প্রখ্যাত মুসতাশরিক 'থমাস আরনোল্ড' এর সঙ্গে তারা ঠিক এ আচরণটাই করেছে। তিনি الدعوة إلى الإسلام নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বইটিতে তিনি মুসলমানদের ব্যাপারে অনেকগুলো ন্যায়সঙ্গত তথ্য উপস্থাপন করেছিলেন। বিশেষত বিধর্মীদের সঙ্গে মুসলমানদের উদারতা ও সদ্ভাব এবং এর বিপরীতে মুসলমানদের ওপর অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিপীড়ন-নির্যাতনের কিছু চালচিত্র ঐতিহাসিক দলীল-দস্তাবেজ সহকারে তুলে ধরেছিলেন। বইটিকে ইসলামের ধর্মীয় উদারতা ও সম্প্রীতির ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থ বিবেচনা করা হয়। বইটি প্রকাশের পর কট্টোর ওরিয়েন্টালিস্ট সমাজের পক্ষ থেকে তার ওপর সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। বিশেষত খ্রিস্টান মিশনারীরা শক্তভাষায় তার বিরুদ্ধে কটুক্তি করেছে। তারা এ অভিযোগ তুলেছে, থমাস আরনোল্ড মুসলিমপ্রেমের অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে বইটি লেখেছে। অথচ বাস্তবতা হলো, গুণী এ লেখক তার ওই বইয়ে কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনার তথ্য নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থের উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে উপস্থাপন করেননি।

এ দলটিতে এমন কিছু লোকও রয়েছেন, যাদের মনে ছিলো সত্য জানার তুমুল আগ্রহ। এই আগ্রহই গবেষণার এক পর্যায়ে তাদেরকে ইসলামের আলোকিত রাজপথে নিয়ে আসে। যার ফলে বাকি জীবন তারা যদিও

Scanned by CamScanner

পশ্চিমা সমাজে বসবাস করেছেন; কিন্তু স্রোতের বিরুদ্ধে আমরণ অবস্থান করে ইসলামের মুখপাত্র হয়ে নিঃসঙ্গ লড়াই চালিয়ে গেছেন। তাদেরই একজন হলেন প্রখ্যাত ফরাসি অভিনেতা 'ডেনিয়া'। এই প্রাচ্যবিদ দীর্ঘদিন আলজেরিয়ায় বসবাস করেন। প্রাচ্য সম্পর্কে অধ্যয়নের একপর্যায়ে তিনি ইসলামের গুণমুগ্ধ হন এবং ঘোষণা দিয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজের নাম রেখেছিলেন, 'নাসিরুদ্দীন ডেনিয়া'। আলজেরিয়ার একজন স্থানীয় আলেমকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের ওপর একটি অনন্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁরই আরেকটি রচনার নাম— أشعة خاصة بنور الإسلام। বইটির মাঝে তিনি ইসলাম ও মহান নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তার স্বজাতির আক্রমণের ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন।

এই মুসলিম মুসতাশরিকের ইনতিকাল হয়েছিলো ফ্রান্সে। মৃত্যুর পর তার মরদেহ আলজেরিয়ায় নিয়ে আসা হয়। সেখানেই তার জানাযা ও দাফন-কার্য সম্পন্ন হয়।

Scanned by CamScanner



প্রাচ্যবিদরা কীভাবে তাদের দূরভিসন্ধি বাস্তবায়ন করছে?

ওরিয়েন্টালিস্ট সমাজ তাদের চিন্তাধারা ও গবেষণা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রচেষ্টা বাদ রাখেনি। প্রচার-প্রসারের এমন কোনো পথ নেই, যা তারা অবলম্বন করেনি। তাদের কিছু প্রচেষ্টার তালিকা সংক্ষেপে পেশ করছি—

১. ইসলামি চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি, রাসূল সা. ও কুরআন কারীম সম্পর্কে বই-পুস্তক রচনা করা। তারা তাদের সিংহভাগ রচনাবলির মাঝে ভাষ্য নকল করার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে। শুধু তাই নয়, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো বোঝা ও সেখান থেকে ফলাফল উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রেও তারা কারণে-অকারণে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

২. ইসলাম, মুসলমান ও মুসলিম জাহান সম্পর্কে এমন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন বের করা, যেখানে শুধু তাদের গবেষণাকর্মই প্রকাশিত হবে।

৩. গণউন্নয়ন ও সেবার ছদ্মাবরণে মুসলিম জাহানে খ্রিস্টান মিশনারী প্রেরণ করা। এ উদ্দেশ্যে পূরণ করতেই তারা ব্যাপক হারে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মতো দাতব্য সংস্থা, হাসপাতাল, স্কুল, আশ্রয়কেন্দ্র, অনাথ আশ্রম ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয় ও জ্ঞানচর্চাকেন্দ্রগুলোতে নিবন্ধ উপস্থাপন করা। অত্যন্ত পরিতাপ ও মনোবেদনার বিষয় হলো, এই কট্টোর ইসলামবিদ্বেষী লোকগুলোকেই মিসরের কায়রো, সিরিয়ার দামেশক, ইরাকের বাগদাদ, মরক্কোর রাবাত, পাকিস্তানের করাচি ও লাহোর, ভারতের আলীগড় সহ বিভিন্ন মুসলিম ও আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

Scanned by CamScanner

৫. জাতীয় ম্যাগাজিনগুলোতে তাদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করা। রূঢ় বাস্তবতা হলো, তারা আমাদের এদেশের অনেকগুলো জাতীয় পত্রিকা কিনে ফেলেছে। ডক্টর আহমদ ফররুখ ও মুসতফা আল খালেদী সম্মিলিতভাবে একটি বই রচনা করেছেন। বইটির নাম التبشير والاستعمار। সেবার ছদ্মাবরণে মুসতাশরিক ও খ্রিস্টান মিশনারীরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কোন কোন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে, সে ব্যাপারে এ বইটি নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক দস্তাবেজ।[৪] সেখানে এসেছে—

> يعلن المبشرون أنهم استغلوا الصحافة المصرية على الأخص للتعبير عن الآراء المسيحية أكثر مما استطاعوا في أي بلد إسلامي آخر، لقد ظهرت مقالات كثيرة في عدد من الصحف المصرية، إما مأجورة في أكثر الأحيان، أو بلا أجرة في أحوال نادرة.
>
> 'খ্রিস্টান মিশনারীরা জোর গলায় এ কথা ঘোষণা করেছে যে, তারা অন্যান্য মুসলিম দেশের তুলনায় সবিশেষ সক্ষমতা সহকারে মিসরি গণমাধ্যমকে খ্রিস্টিয় চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার-প্রসারের কাজে ব্যবহার করেছে। যার ফলে দেখা যায়, মিসরি পত্র-পত্রিকায় তাদের অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। অল্প-বিস্তর কিছু প্রবন্ধ বিনা পারিশ্রমিকে আলোর মুখ দেখেছে।'

৬. গবেষণার নামে নিজস্ব পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি সুচারুরূপে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কনফারেন্স আয়োজন। প্রাচ্যবিদরা ১৭৮৩ সাল থেকে অদ্যাবধি নিয়মিত কনফারেন্স আয়োজন করে যাচ্ছে।

৭. ইসলামিক ইনসাইক্লোপিডিয়া। তারা বিভিন্ন ভাষায় বিশ্বকোষ প্রকাশ করেছে। নিয়মিত সেগুলোর নতুন নতুন সংস্করণ বের করছে। আমি যখন ১৯৫৬ সালে অক্সফোর্ডে আসি তখনই ইনসাইক্লোপিডিয়ার সচিব আমাকে

---

৪. বইটি প্রত্যেক মুসলিম শিক্ষিত ব্যক্তির পড়া দরকার। বৈরুত থেকে বইটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চাটুকাররা অতীতে সিরিয়ায় বইটি নিষিদ্ধ করার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছে।

Scanned by CamScanner

মৌখিকভাবে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ডগুলো প্রকাশিত হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। এখন প্রথম সংস্করণের আরবি অনুবাদের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে এর ১৩ টি খণ্ড আলোর মুখ দেখেছে।

এই ইনসাইক্লোপিডিয়ার মাঝে অনেক বড় বড় ইসলামবিদ্বেষী ওরিয়েন্টালিস্ট কাজ করেছে। যাদের অনেকের ইসলামবৈরী কর্মকাণ্ড দিবালোকের মতো স্পষ্ট। বাস্তবতা হলো, প্রাচ্যবিদরা ইনসাইক্লোপিডিয়ার মাঝে অসংখ্য বিষমিশ্রিত তথ্য প্রবিষ্ট করেছে। শুধু তাই নয়; ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে সেখানে প্রচুর মিথ্যা ও মনগড়া কথাবার্তা উঠে এসেছে।

দুঃখের বিষয় হলো, হাল জামানার অনেক শিক্ষিত মুসলিম এই ইনসাইক্লোপিডিয়াকে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-উৎস মনে করে। এমনকি তারা তাকে যেকোনো আলোচনার ক্ষেত্রে বিতর্কহীন প্রমাণ জ্ঞান করে। নিঃসন্দেহে এটি তাদের ইসলামি ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা ও তাদের আত্মসম্মানবোধহীনতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এতক্ষণ আমি প্রাচ্যবিদদের শ্রেণিভেদ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত কথা তুলে ধরলাম। এখন আমি পাঠকবর্গকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর আরও কিছু উপকারী কথা বলবো। বর্তমান যুগে কোন কোন মুসতাশরিক ইসলাম ও মুসলমানের জন্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর, তাদের সর্বাধিক আলোচিত বই-পুস্তক কি কি, বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে তারা কী নামে পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন বের করছে, সে সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো, ইনশা-আল্লাহ।[৫]

---

[৫]. মুসতাশরিকদের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনাবলি ও তাদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার নাম সম্বলিত এ তালিকাটি সংগৃহিত হয়েছে ডক্টর মুহাম্মদ আল-বাহীর গবেষণালব্ধ লেকচার থেকে। যার শিরোনাম– المبشرون والمستشرقون وموقفهم من الإسلام।

Scanned by CamScanner



প্রাচ্যবিদ মহল কর্তৃক প্রকাশিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা

১. ১৭৮৭ সালে ফরাসিরা ওরিয়েন্টালিস্টদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। ১৮২০ সালে তারা এ সংগঠনটিকে অন্য একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করে المجلة الآسيوية নামে একটি পত্রিকা বের করে।

২. লন্ডনে প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ক পড়াশুনার ওপর উৎসাহ প্রদান করার উদ্দেশ্যে ১৮২৩ সালে একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজা ছিলেন সংগঠনটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সংগঠনটি الجمعية الآسيوية الملكية নামে একটি পত্রিকা বের করতো।

৩. ১৮৪২ সালে আমেরিকানরা একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। তারা الجمعية الشرقية الأمريكية নামে একটি পত্রিকা বের করতো। এ বছরেই জার্মান প্রাচ্যবিদরাও একটি বিশেষ পত্রিকা বের করে। প্রাচ্যবিদ মহল কর্তৃক পত্রিকা প্রকাশের এই ঢেউ ইউরোপ-রাশিয়ার অপরাপর দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। অস্ট্রিয়া, ইটালি ও রাশিয়া থেকে একের পর এক পত্রিকা বেরোতে থাকে।

৪. এই শতাব্দীতে মার্কিন ওরিয়েন্টালিস্টরা আরেকটি পত্রিকা বের করে। যার নাম جمعية الدراسية الشرقية। পত্রিকাটি সেখানকার ওহিয়ো (Ohio) প্রদেশের গাম্বিয়ার (Gambier) শহর থেকে বেরুতো। একসময় বিশ্বের বিভিন্ন জনবহুল শহরে পত্রিকাটির শাখা অফিস ছিলো। ইংল্যান্ডের লন্ডন, ফ্রান্সের প্যারিস ও কানাডার টরোন্টোতে শাখা অফিস ছিলো। বর্তমানে পত্রিকাটি বের হচ্ছে কি, হচ্ছে না– সেই তথ্য আমার হাতে নেই।

Scanned by CamScanner

এটি ছিলো রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদী ইসতিশরাক ঘরানার পত্রিকা। তবে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় জটিলতা, বিশেষত কিতাবাদি নিয়েও আবির্ভূত হতো।

৫. বর্তমান সময়ে মার্কিন ওরিয়েন্টালিস্টরা الأوسط الشرق ও شؤون الشرق الأوسط নামে দু'টি পত্রিকা বের করছে। পত্রিকাদুটি সাধারণত রাজনৈতিক ভাবাপন্ন হতো।

৬. বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বিপদজনক পত্রিকা বের করছে মার্কিন ওরিয়েন্টালিস্ট মহল। পত্রিকাটির নাম দ্যা মুসলিম ওয়ার্ল্ড (The Muslim World)। পত্রিকাটি সর্বপ্রথম ১৯১১ সালে বের করে তার প্রথম পৃষ্ঠপোষক জুইম্যার (Zweimer)। ওই সময় পত্রিকাটি আমেরিকার হার্টফোর্ড থেকে প্রকাশিত হতো। তার প্রধান সম্পাদক ছিলো কে ক্রাগ (K. Cragg)। পত্রিকাটি শতভাগ খ্রিস্টান মিশনারী মানসিকতা সম্পন্ন।

৭. ফরাসি ওরিয়েন্টালিস্টরা 'লি মন্ড মুসলমান' (Le Monde Musalman) নামে একটি পত্রিকা বের করে থাকে। মানসিকতা ও বৈরী ভাবাপন্ন মিশনারী চেতনার বিচারে পত্রিকাটি অবিকল العالم الإسلامي [আল-আলামুল ইসলামী] ম্যাগাজিনের মতো।

Scanned by CamScanner



বর্তমান যুগের কয়েকজন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই

এ. জে. আরবারি (A. J. Arberry)

তিনি একজন ইংরেজ লেখক। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি প্রসিদ্ধ। লোকটি ইসলামি বিশ্বকোষের লেখকমণ্ডলীর একজন। বর্তমানে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করছে। আফসোসের বিষয় হলো, এমন লোকের কাছেই অনেক বিখ্যাত মিসরি আলেম ইসলাম ও আরবি সাহিত্যের ওপর পড়াশুনা করেছে। তার কিছু বই হলো–

১. الإسلام اليوم । বইটি ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়।

২. مقدمة لتاريخ التصوف । এটি ১৯৪৭ সালে আলোর মুখ দেখে।

৩. التصوف । ১৯৫০ সালে মুদ্রিত।

৪. ترجمة القرآن । এ অনুবাদকর্ম ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়।

আলফ্রেড জিওম (A. Geom)

এ যুগের ইংরেজ প্রাচ্যবিদ। ইসলামের বিরুদ্ধে তার গোঁড়ামি প্রসিদ্ধ। লোকটি ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিয়ে থাকে। তার প্রতিটি লেখা ও চিন্তাধারায় মিশনারীসুলভ মানসিকতার প্রাবল্য দেখা যায়। তার একটি আলোচিত বইয়ের নাম الإسلام। আফসোসের বিষয় হলো, মিসর সরকার যেসকল মেধাবীকে রাষ্ট্রীয় অর্থে পশ্চিমা ভাষা শেখার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে, তাদের সিংহভাগ এ লোকটির শিষ্য।

Scanned by CamScanner

ব্যারন কারা ডি ভক্স (Baron Carra de Vaux)

ইসলাম ও মুসলমানদের কট্টোর বিদ্বেষী ফরাসি প্রাচ্যবিদ। ইসলামি বিশ্বকোষের শীর্ষ সারির লেখক। লোকটি বেশ দক্ষতার সঙ্গে বিশ্বকোষ প্রকল্পে অবদান রেখেছে।

এইচ. এ. আর. গিব (H. A. R. Gibb)

ইংল্যান্ডের বর্তমান প্রাচ্যবিদদের নেতা। মিসরের المجمع اللغوي [ভাষা পর্ষদ] এর সদস্য। বর্তমানে হার্টফোর্ড এমেরিকান ইউনিভার্সিটির অ্যারাবিক ও ইসলামিক স্ট্যাডিজের অধ্যাপক। ইসলামি বিশ্বকোষের অন্যতম প্রকাশক ও শীর্ষ সারির লেখক। তার অনেকগুলো বই রয়েছে। বইগুলোতে তার অধ্যয়নের গভীরতা ও আলোচনার ব্যাপ্তি ফুটে উঠেছে। যা তাকে অন্যদের চেয়ে স্বাতন্ত্র্য শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। নিম্নে তার কয়েকটি বইয়ের তালিকা তুলে ধরছি–

১. طريق الإسلام [তরীকুল ইসলাম]। আরো কয়েকজন লেখককে সঙ্গে নিয়ে তিনি এ বইটি লিখেছেন। বইটি মূলতঃ ইংরেজি ভাষায় লেখা। উপরের শিরোনামে আরবিতে অনূদিত হয়েছে।

২. الإتجاهات الحديثة في الإسلام [আল ইত্তিজাহাতুল হাদীসা ফিল ইসলাম]। বইটি ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। এর একাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে। এ বইটিও ইংরেজিতে লেখা। উপরিউক্ত শিরোনামে আরবিতে অনূদিত হয়েছে।

৩. المذهب المحمدي [আল মাযহাবুল মুহাম্মাদী]। বইটি ১৯৪৭ সালে আলোর মুখ দেখে। এ বইটিরও একাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে।

৪. الإسلام والمجتمع الغربي [আল ইসলাম ওয়াল মুজতামাউল গরবি]। বইটি একাধিক খণ্ডে মুদ্রিত। এ বইটিও তিনি কয়েকজন লেখককে সঙ্গে নিয়ে লিখেছেন।

এর বাইরে তার আরও অনেকগুলো বই ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ রয়েছে।

Scanned by CamScanner

গোল্ড যেহের (Gold Ziher)

আরবিতে তার নাম লেখা হয় جولد تسهير। ইসলামবৈরী লেখক হিসেবে বিশ্বজুড়ে প্রসিদ্ধ। ইসলামি ইনসাইক্লোপিডিয়ার অন্যতম লেখক। এর বাইরে সে কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে প্রচুর লেখালেখি করেছে। তার একটি বই تاريخ مذاهب التفسير السياسي। বইটি মূলত ইংরেজিতে লেখা। যা উল্লেখিত শিরোনামে আরবিতে অনূদিত হয়েছে।

জন মাইনার্ড (Jhon Maynard)

মার্কিন উগ্র লেখক। মার্কিন ওরিয়েন্টালিস্টদের মুখপত্র جمعية الدراسات الشرقية। এর নিয়মিত লেখক। বিশেষত ইসলাম ও মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে তার আধুনিক বইগুলো পাঠকমহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, উল্লেখিত ম্যাগাজিনের এপ্রিল ১৯২৪ সংখ্যা দেখা যেতে পারে। [খণ্ড নম্বর– ৮, সংখ্যা– ২, পৃষ্ঠা– ১২২।

এস. এম. জুইমার (S M Zweimer)

একজন মিশনারী প্রাচ্যবিদ। কঠোর ইসলামবিরোধী মনোভাবের কারণে বিশ্বজুড়ে আলোচিত। মার্কিন মিশনারীদের পত্রিকা العالم الإسلامي। [আল আলামুল ইসলামি] এর প্রতিষ্ঠাতা। তার আলোচিত বই نحد الإسلام لعقيدة। বইটি ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। তার আরেকটি পরিচয় হলো, সে الإسلام। নামের একটি বইয়ের প্রকাশক। ভারতের লাখনৌ শহরে ১৯১১ সালে দ্বিতীয় মিশনারী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ওই কনফারেন্সে পঠিত সকল প্রবন্ধ الإسلام। নামের এই সংকলনে প্রকাশিত হয়। তার মিশনারী কর্মকাণ্ডের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমেরিকানরা তার নামে একটি ওয়াক্ফ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। এই বোর্ডের কাজ হলো ধর্মীয় শিক্ষার ওপর জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং খ্রিস্টান মিশনারী তৈরি করা।

আযীয আতিয়্যা সুরিয়াল

মিসরি খ্রিস্টান। লোকটি প্রথমে ইসকান্দারিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলো। এখন আমেরিকার একটি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ

Scanned by CamScanner

পেয়েছে। ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু হিসেবে প্রসিদ্ধ। লোকটি তার বইয়ে নিয়মিত ইসলামি শিক্ষা বিকৃত আকারে উপস্থাপন করে থাকে। যেহেতু তার অবস্থান মিসর ও মুসলমানদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে, যার কারণে সে অবলীলায় নিজের ইসলামবিরোধী মানসিকতা ও বিকার-বিকৃতির অপকর্মগুলো একের পর এক উগড়ে যাচ্ছে। ক্রুসেড যুদ্ধের ব্যাপারেও সে অনেকগুলো বই লেখেছে।

জি, ভন গ্রাউনবাম (G. Von Graunbaum)

লোকটি মূলত জার্মান ইয়াহুদি। পরবর্তীকালে দেশত্যাগ করে আমেরিকায় চলে এসেছে। প্রথমদিকে শিকাগো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলো। এখন আমেরিকার আরও কিছু ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছে। তাকে চরম ইসলামবিদ্বেষী মনে করা হয়। তার অধিকাংশ বই অগভীর। বিশেষত ইসলামি মূল্যবোধ ও মুসলমান বিষয়ক তথ্যের ক্ষেত্রে সে সীমাতিরিক্ত অসততার আশ্রয় নিয়েছে। লোকটি প্রচুর লেখালেখি করেছে। প্রাচ্যবিদ মহলে তার বইগুলো অনেক জনপ্রিয়। যার কারণে তার প্রচুর ভক্ত-অনুরক্ত রয়েছে। তার কিছু বইয়ের তালিকা তুলে ধরছি–

১. إسلام العصور الوسطى [ইসলামুল উসূরিল উসতা– মধ্যযুগীয় ইসলাম]। বইটি ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়।

২. الأعياد المحمدية [আল আ'ইয়াদুল মুহাম্মাদিয়্যাহ– মুহাম্মাদী উৎসব]। এটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫১ সালে।

৩. محاولات في شرح الإسلام المعاصر [মুহাওয়ালাতুন ফী শরহিল ইসলামিল মু'আসির]। ১৯৪৭ ঈসাব্দে প্রকাশিত।

৪. دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية [দিরাসাতুন ফী তারীখিস সাকাফাতিল ইসলামিয়্যাহ]। বইটি ১৯৫৪ সালে আলোর মুখ দেখে।

৫. الإسلام [আল ইসলাম]। এটি অনেকগুলো প্রবন্ধের সংকলন। যা ১৯৫৭ সালে মুদ্রিত হয়।

৬. الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية [আল ওয়াহদাতু ওয়াত তানা'উ ফিল হাদারাতিল ইসলামিয়্যাহ]। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে।

Scanned by CamScanner

ফিলিপ হিট্টি (Ph. Hitti)

প্রসিদ্ধ লেবানিজ মিশনারী। পরবর্তীকালে আমেরিকায় থিতু হয়। আমেরিকার প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক অনুষদের অধ্যাপক। পরবর্তীকালে সে এই অনুষদের পরিচালক মনোনীত হয়। বর্তমানে অবসরে আছে। ইসলামবিদ্বেষী লেখকদের হোতা। আমেরিকায় আরব বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে নিজ দেশের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে থাকে। মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক ব্যাপারগুলোতে লোকটি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাররি উপদেষ্টার পদে নিয়োজিত রয়েছে। তার সার্বক্ষণিক ধ্যান-জ্ঞান হলো, কীভাবে মানব সভ্যতার বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা খাটো করা যায়। লোকটি কখনই কোনো বিষয়ে মুসলমানদের অবদান ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে না। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত মার্কিন বিশ্বকোষের ১২৯ পৃষ্ঠায় 'আরবি সাহিত্য' শিরোনামের অধীনে এ কথা লেখেছে যে, 'আধুনিক সাহিত্যে প্রাণের ছোঁয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে কখনই প্রকাশ পায়নি। এক্ষেত্রে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের সিংহভাগই হলেন লেবাননের ওই সকল খ্রিস্টান যারা মার্কিন মিশনারীদের প্রচেষ্টায় শিক্ষার্জন করেছেন ও আত্মবিনির্মাণ করেছেন।'

ফিলিপ হিট্টির এই ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদাহানীর অপপ্রয়াস নিরেট আধুনিক যুগের ভেতর সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার অপকর্ম ইসলামের ইতিহাসের সবগুলো স্তরের ওপর ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয়টি তার বিভিন্ন বইয়ে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। তার কয়েকটি বই হলো–

১. تاريخ العرب [তারীখুল আরব] তার লেখা একটি ইংরেজি বই। যার একাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে। বইটিতে ইসলাম সম্পর্কে চরম মিথ্যাচার ও নবী মুহাম্মাদ সা. সম্পর্কে অরুচিকর বিদ্রুপ করা হয়েছে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বইটি আদ্যোপান্ত হিংসা, বৈরীতা, ঘৃণা, হিংসা ও মিথ্যাচারে টইটুম্বর। বইটি সম্পর্কে অধিকতর জানতে পাকিস্তানের করাচি থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ম্যাগাজিন 'আল-ইসলাম' এর এপ্রিল ১৯৫৮ এর ১৩৮ নম্বর পৃষ্ঠা ও মে ১৯৫৮ এর ১৪৬ নম্বর পৃষ্ঠা দেখুন।

Scanned by CamScanner

২. تاريخ سوريا [তারীখে সিরিয়া]।

৩. أصول الدروز وديانتهم। এ বইটি ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

এ. জে. ওয়েনসিংক (A. J. Wensink)

ইসলাম ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরম শত্রু। লোকটি مجمع اللغوي المصري এর সদস্য ছিলো। একটি অপ্রীতিকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ওই সংস্থা থেকে বহিষ্কার করা হয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ডক্টর হাবীব হুসাইন আল-হুওয়ারী المستشرقون والإسلام নামে একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৯৩৬ সালে এমন এক মুহূর্তে প্রকাশিত হয় যখন এ জে ওয়েনসিংক কুরআন ও রাসূল সা.-এর ব্যাপারে এ দাবী ঘোষণা করে যে, 'মুহাম্মদ (সা.) পূর্ববর্তী যুগের দর্শন ও ধর্মীয় গ্রন্থাবলির সহায়তা নিয়ে কুরআন রচনা করেছেন।' বিষয়টি সম্পর্কে আরও জানতে হলে المستشرقون والإسلام গ্রন্থের ৭১ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো পড়ুন।

এ জে ওয়েনসিংকের আরেকটি বই আছে। নাম عقيدة الإسلام। এটি ১৯৩২ সালে আলোর মুখ দেখে।

কে. ক্র্যাগ (K. Cragg)

উগ্র ইসলামবিদ্বেষী মার্কিন প্রাচ্যবিদ। দীর্ঘ দিন কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেছে। বর্তমানে মার্কিন মিশনারী পত্রিকা العالم الإسلامي এর প্রধান সম্পাদক ও হার্টফোর্ড ইউনিভার্সিটির মিশনারী ধর্মীয় শিক্ষা অনুষদের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছে। তার একটি বইয়ের নাম دعوة المئذنة। যা ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

এল. ম্যাসিগনন (L. Massignon)

বর্তমান যুগের শীর্ষস্থানীয় ফরাসি প্রাচ্যবিদ। সাম্রাজ্যবাদী ফরাসি সরকারের দক্ষিণ আফ্রিকা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা। মিসরে কর্মরত ফরাসি খ্রিস্টান মিশনারী সংগঠনগুলোর আধ্যাত্মিক পুরোধা। লোকটি একাধিকবার

Scanned by CamScanner

মুসলিম জাহান পরিভ্রমণ করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একাধারে পাঁচ বছর ফরাসি সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলো। লোকটি দামেশকের المجمع العلمي العربي [আল মাজমাউল ইলমিয়্যুল আরাবি] ও মিসরের المجمع اللغوي [আল-মাজমাউল লুগাভি] এর সক্রিয় সদস্য ছিলো। ইসলামি তাসাওউফ ও দর্শন শাস্ত্রে তার গভীর পাণ্ডিত্য ছিলো। তার একটি আলোচিত বইয়ের নাম الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام। বইটি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। দর্শন ও তাসাওউফ সম্পর্কে সে বেশক'টি বই লেখেছে। তাকে ইসলামি বিশ্বকোষ প্রকল্পের শীর্ষসারির লেখক মনে করা হয়।

ডি.বি. ম্যাকডোনাল্ড (D. B. Macdonald)

ইসলাম ও মুসলমান বিদ্বেষী উগ্র মার্কিন সমাজের প্রতিনিধি। তার লেখার ছত্রে ছত্রে নিরেট মিশনারী মানসিকতা ফুটে ওঠে। এ লোকটিও ইসলামি বিশ্বকোষ প্রকল্পের শীর্ষসারির লেখক। তার লেখা কয়েকটি বই হলো,

১. تطور علم الكلام والفقه النظرية الدستورية في الإسلام। বইটি ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয়।

২. الموقف الديني والحياة في الإسلام। এটি ১৯০৮ সালে মুদ্রিত হয়।

এম. গ্রিন (M Green)

الشرق الأوسط الإسلامي [আশ-শারকুল আওসাতুল ইসলামি] পত্রিকার সম্পাদক।

মাজীদ কুদুরি (Majid Qudoori)

ইরাকি মিশনারী। ওয়াশিংটনের জন হপকিংস ইউনিভার্সিটির মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক অনুষদের প্রধান। ওয়াশিংটনস্থ মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিচালক। তার ইসলাম ও মুসলিম-বৈরীতার কথা সর্ববিদিত। তাকে উগ্র মার্কিন প্রাচ্যবিদ মনে করা হয়। তার প্রতিটি লেখা মুসলমানদের সম্পর্কে তীব্র শ্লেষ, বিদ্রুপ ও সমালোচনায় টইটম্বুর হয়ে থাকে। তার লেখা একটি বইয়ের নাম, الحرب والسلام في الإسلام। বইটি ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তার আরও কিছু প্রবন্ধ রয়েছে।

Scanned by CamScanner

ডি. এস. মার্গোলিউথ (D. S. Margoliouth)

উগ্র ইসলামবিদ্বেষী ইংরেজ প্রাচ্যবিদ। ইসলামি বিশ্বকোষের অন্যতম লেখক। একসময় দামেশকের المجمع اللغوي المصري এর সদস্য ছিলো। তার লেখা কয়েকটি বই হলো–

১. التطورات المبكرة في الإسلام। বইটি ১৯১৩ সালে আলোর মুখ দেখে।

২. محمد ومطلع الإسلام। বইটি ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. الجامعة الإسلامية। এটি ১৯১২ সালে মুদ্রিত হয়।

আর. এন. নিকলসন (R. N. Nickolson)

ইংল্যান্ডের আধুনিক প্রজন্মের শীর্ষস্থানীয় প্রাচ্যবিদ। তাকে বিশ্বকোষ প্রকল্পের অন্যতম মেধাবী লেখক মনে করা হয়। ইসলামি তাসাওউফ ও ফিলোসফি শাস্ত্রের ওপর ডক্টরেট করেছে। এক সময় المجمع اللغوي المصري এর সদস্য ছিলো। লোকটি ইসলামকে আধ্যাত্মিক ধর্ম স্বীকার করতো না। তার ভাষায়, ইসলাম এমন একটি বস্তুবাদী ধর্ম যা মানবিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ নয়। তার লেখা কয়েকটি বই হলো–

১. متصوفوا الإسلام । এটি ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

২. التاريخ الأدبي للعرب। এটি ১৯৩০ সালে আলোর মুখ দেখেছে।

এইচ. পি. এইচ. (H. P. H.)

মার্কিন ম্যাগাজিন الشرق الأوسط এর প্রধান সম্পাদক ছিলো। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ওপর আধুনিক যুগের যে ক'টি পত্রিকা পাখির চোখে পর্যবেক্ষণ করতো, তিনি ছিলেন সেই পত্রিকাগুলোর মধ্য হতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার কৌশল নির্ধারক।

হেনরি ল্যামান্স (H. Lammens)

ফরাসি প্রাচ্যবিদ। জন্ম– ১৮৭২ ঈ.। মৃত্যু– ১৯৩৭ ঈ.। ইসলামি বিশ্বকোষের অন্যতম লেখক। লোকটি ইসলাম বিদ্বেষী ভূমিকা ও হিংসাত্মক মনোবৃত্তির প্রকাশের ক্ষেত্রে এতো বেশি অতিরঞ্জন করতো যে,

Scanned by CamScanner

তা নিয়ে অনেক সময় খোদ প্রাচ্যবিদরাই বিব্রত বোধ করতো। তার সম্পর্কে অধিকতর জানতে جمعية الدراسات الشرقية [জামইয়্যাতুদ দিরাসাতিশ শারকিয়্যাহ] পত্রিকার ৯ জানুয়ারি ১৯২৫ সংখ্যার ১ম খণ্ডের ১৫ ও ১৬ নম্বর পৃষ্ঠা দেখুন। ফরাসি ভাষায় তার লেখা কয়েকটি বইয়ের আরবি সংস্করণের নাম হলো–

১. الإسلام।

২. اللطائف।

যোসেফ স্কট (J. Schacht)

বিতর্কিত ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষীয় জার্মান প্রাচ্যবিদ। ইসলামি ফেকাহ ও তার মূলনীতি সম্পর্কে লোকটি বেশক'টি বই লেখেছে। কর্মজীবনে সে ইসলামি বিশ্বকোষ ও সামাজিক জ্ঞান বিশ্বকোষের লেখক পরিষদের সদস্য ছিলো। তার অন্যতম প্রসিদ্ধ বই হলো, أصول الفقه الإسلامي [উসূলুল ফিকহিল ইসলামি]।

Scanned by CamScanner



প্রাচ্যবিদদের এমন কিছু বিপদজনক রচনা– যা কারো কারো কাছে সমাদৃত

বিশ্বকোষ

১. ইসলামি বিশ্বকোষ (The Encyclopeadia of Islam)। পৃথিবীর অনেকগুলো জীবন্ত ভাষায় বিশ্বকোষটি প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে নিয়মিত এটির একের পর এক সংস্করণ বেরোচ্ছে। নতুন সংস্করণের অনেকগুলো খণ্ড ইতোমধ্যে আলোর মুখ দেখেছে।

২. সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ (Shorter Encyclopeadia of Islam)।

৩. ধর্ম ও নৈতিকতার বিশ্বকোষ (Encyclopeadia of Religion & Ethicss)। এটি মূলত ইসলামের বিভিন্ন প্রতিপাদ্য সম্পর্কিত প্রবন্ধগুচ্ছের সংকলন।

৪. ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ সোশাল সাইন্স (Encyclopeadia of Socioal Sciences)। বইটি আরব ও ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন।

৫. دراسات في التاريخ। এটি এ. টয়নবি (A. Toynbee) এর বই। বিষয়বস্তু হলো, ইসলাম ও তার পয়গম্বর।

অপরাপর প্রসঙ্গে

১. حياة محمد [হায়াতু মুহাম্মদ]। লেখক ডব্লিউ ম্যুর (W. Muir)।

২. الإسلام [আল-ইসলাম]। লেখক আলফ্রেড ইওম (A. Eeom)।

Scanned by CamScanner

৩. دين الشيعة লেখক ডি. এম. ডোনাল্ডসন (D. M. Donaldson)

৪. تاريخ الشارل الكبير । লেখক বিশপ তুরপিন (Bishop Turpin) ।

৫. الإسلام লেখক এইচ. ল্যামন্স (H. Lammens)। বইটি ফ্রেঞ্চ ভাষায় প্রকাশিত।

৬. الإسلام تحد لعقيدة। লেখক এস. এম. জুইমার (S. M. Zweimer)। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিলো।

৭. دعوة المئذنة। লেখক কে ক্র্যাগ (K. Cragg)। এটিও ইংরেজি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো।

৮. الإسلام اليوم। লেখক এ. জে. এবারি (A. J. Aberry)।

৯. ترجمة القرآن (ইংরেজি অনুবাদ)। লেখক এ. জে. এবারি (A. J. Aberry)

১০. تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي। লেখক গোল্ড যেহের (Gold Ziher)। মূল বইটি জার্মান ভাষায় মুদ্রিত হয়। পরবর্তীকালে আরবিতে অনূদিত হয়।

১১. تاريخ العرب। লেখক ফিলিপ হিট্টি (Ph. Hitti)। বইটি আরবি ও ইংরেজি দু' ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। বইটির অনেকগুলো সংস্করণ বেরিয়েছে।

১২. اليهودية في الإسلام। লেখক আব্রাহাম ক্যাচ (Abraham Kach)। ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে।

১৩. عقيدة الإسلام। লেখক এ. জে. উইনসিংক (A. J. Wensink)। এটিও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৪. الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام। লেখক এল. ম্যাসিগনন (L. Massignon)। এটি ফ্রেঞ্চ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

১৫. الحرب والسلام في الإسلام। লেখক মাজিদ কুদুরি (Majid Qudoori)। এটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৬. تطور علم الكلام والفقه النظرية الدستورية في الإسلام। লেখক, ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ড (D.B. Macdonald)। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৭. الإتجاهات الحديثة في الإسلام। লেখক এইচ. এ. আর. গিব (H. A. R. Gibb)। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে আরবিতে অনূদিত হয়।

১৮. طريق الإسلام । প্রথমে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে আরবিতে অনূদিত হয়। প্রাচ্যবিদদের একটি দল সম্মিলিতভাবে বইটি রচনা করে। যাদের একজন হলেন, এইচ. এ. আর. গিব (H. A. R. Gibb)।

১৯. التصوف في الإسلام। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে আরবিতে অনূদিত হয়। লেখক আর. এ. নিকলসন (R. A. Nicholson)।

২০. مصادر تاريخ القرآن। ইংরেজিতে লেখা বইটির সংকলক অর্থার জেফরি (Arthur Jeffry)।

২১. أصول الإسلام في بيئته المسيحية । ইংরেজিতে লেখা এ বইয়ের রচয়িতা আর. বেল (R. Bell)।

২২. مقدمة القرآن । ইংরেজিতে লেখা এ বইটিরও রচয়িতা আর. বেল (R. Bell)।

২৩. التطورات المبكرة في الإسلام। ইংরেজিতে লেখা এ বইয়ের রচয়িতা ডি. এস. মার্গলিউথ (D. S. Margoliouth)।

২৪. محمد ومطلع الإسلام। এটিও ডি. এস. মার্গলিউথের রচনা (D. S. Margoliouth)।

Scanned by CamScanner

২৫. الإسلام। ইংরেজিতে লেখা এ বইটিরও রচয়িতা ডি. এস. মার্গলিউথ (D. S. Margoliouth)।

২৬. الجامعة الإسلامية। ইংরেজি ভাষায় লেখা এ বইটিও ডি. এস. মার্গলিউথের (D. S. Margoliouth) রচনা।

২৭. قنطرة إلى الإسلام। ইংরেজি ভাষায় লেখা এ বইয়ের রচয়িতা এরিক ব্যাটম্যান।

২৮. إسلام العصور الوسطى। লেখেছেন জি. ভন গ্রুনিবাউন (G. Von Grunebaun)। যা ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়।

২৯. الإسلام । এটিও জি. ভন গ্রুনিবাউনের রচনা। ইংরেজিতে প্রকাশিত এ বইয়ের ভেতর মূলত লেখকের বিভিন্ন প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

৩০. الأعياد المحمدية। ইংরেজিতে লেখা এ বইটিও রচনা করেছেন জি. ভন গ্রুনিবাউন ।

৩১. الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية । ইংরেজিতে লেখা এ বইটিও রচনা করেছেন জি. ভন গ্রুনিবাউন।

৩২. دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية। ইংরেজিতে লেখা এ বইটিও রচনা করেছেন জি. ভন গ্রুনিবাউন।

৩৩. محاولات في شرح الإسلام المعاصر। এটি মূলত গ্রুনিবাউনের প্রবন্ধ সংকলন। যা ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে।

Scanned by CamScanner



প্রাচ্যবিদদের গবেষণা ও নিরীক্ষণের মাপকাঠি

প্রাচ্যবিদরা যখন ইসলামি শরিয়তের ওপর লেখালেখি করে তখন তারা গবেষণার নতুন এক বিরল মাপকাঠির আশ্রয় নেয়। অথচ স্বতঃসিদ্ধ কথা হলো, প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ লেখক ও পণ্ডিতকে অবশ্যই কোনো বিষয়ের ওপর গবেষণা করার সময় নিজের সকল ব্যক্তিগত আকর্ষণ ও প্রবৃত্তির ঝোঁক পরিহার করে এগোতে হবে। তার প্রতিটি তথ্য হতে হবে নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। এরপর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পর্যালোচনা করে তাকে এমন এক অকাট্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে, যা সবাই আস্থার সঙ্গে গ্রহণ ও বরণ করে নেবে।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো, প্রাচ্যবিদরা ইসলাম ও ইসলামঘনিষ্ঠ বিষয়ে লেখালেখির সময় কখনই ওই স্বতঃসিদ্ধ মানদণ্ডের ধার ধারে না। তাদের সিংহভাগের অভ্যাস হলো, তারা কোনো বিষয়ে গবেষণার পূর্বে সে বিষয় সম্পর্কে নিজেদের মনে একটি বিশেষ চিন্তাধারা বসিয়ে নেয়। এরপর সেই বিষয়টি প্রমাণিত ও যুক্তিযুক্ত করার জন্যে দলীল সংগ্রহের কাজে নেমে পড়ে। দলীল সংগ্রহের সময় তারা শুধু এতটুকু দেখার চেষ্টা করে যে, এই দলীল তার কথা প্রমাণিত করছে, কি করছে না। বাকি ওই দলীল শুদ্ধ, কি অশুদ্ধ? শুদ্ধ হলে কতোটুকু শুদ্ধ— সেদিকে বিন্দু পরিমাণ লক্ষ্য করে না। এ কারণেই দেখা যায়— তারা সবসময় নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও দাবী-দাওয়া পূরণের ওপরই পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে থাকে। সেমতে আমরা দেখেছি— তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা অগৌণ বিষয় থেকে পুরো মূলনীতি বিধান বানিয়ে নেয়। যাকে আরবিতে বলে, জুযঈ ঘটনা থেকে কুল্লি বিধান তৈরি করা। অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে ব্যাপক ও চিরাচরিত নিয়মে তুলে আনা। এ কারণেই দেখা যায়, তাদের কথাগুলো

Scanned by CamScanner

পরস্পরে তুমুল সাংঘর্ষিক ও বিবাদপূর্ণ হয়ে থাকে। হায়! তারা যদি তাদের গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডে নিজ প্রবৃত্তির এমন সেবানুদাস না হতো তাহলে হয়তো তাদের এই গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড বিশ্ববাসীর উপকার বয়ে আনতো।

আমরা নিম্নে আপনাদের সামনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। আশা করি, এর থেকে আপনারা তাদের অপবিত্র দূরভিসন্ধি ও স্বার্থসিদ্ধির গবেষণার প্রমাণ পাবেন—

১.

গোল্ড যেহের জীবনভর এ মিথ্যা কথা প্রমাণিত করার প্রাণপণে চেষ্টা করেছে যে, হাদীসের এই সুবিশাল ভাণ্ডার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা নয়। বরং এগুলো হলো হিজরী প্রথম তিন শতাব্দীর আবিষ্কার। গোল্ড যেহের এ দাবী তুলেছে যে, হিজরী প্রথম শতাব্দীতে শরীয়তের বিধি-বিধান মুসলমানদের সামনে স্পষ্ট ও সুবিদিত ছিলো না। বড় বড় ইমামগণ শরীয়তের বিধানাবলি এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে অবগত ছিলো না।

গোল্ড যেহের তার এই অবান্তর দাবীগুলো প্রমাণ করার জন্যে ইতিহাসের বিভিন্ন নর্দমা খুড়ে, কয়েকটি ছুড়ে ফেলা বর্ণনা এনে হাজির করেছে। তার উপস্থাপিত দলীলের নমুনা দেখুন। সে দিময়ারীর হায়াতুল হাইওয়ান থেকে এ বর্ণনা নকল করেছে যে, বদর যুদ্ধ আগে সংঘটিত হয়েছে, না ওহুদ যুদ্ধ— এ কথা ইমাম আবু হানীফা রহ. জানতেন না।

বাস্তবতা হলো, এ জাতীয় বর্ণনা খণ্ডন করা তার পক্ষেই সম্ভব যার ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান রয়েছে। কেননা ইমাম আবু হানীফা রহ. হলেন ইসলামের ইতিহাসের সর্বাধিক বিখ্যাত ইমামদের একজন। যে-ক'জন ইমাম তাদের ফেকাহর মাঝে ইসলামের যুদ্ধনীতি সম্পর্কে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কিত হাদীস জনগণ ব্যাপকহারে তাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন সেই বিরলপ্রজ ইমামদের একজন। এমনকি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতো শিষ্যরাও তাদের গ্রন্থাবলির মাঝে ইমাম আবু হানীফার সূত্রে এ সম্পর্কিত বিস্তর হাদীস নকল করেছেন। তাদের মাধ্যমেই ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর জ্ঞান সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে।

Scanned by CamScanner

আপনি বলুন, তাহলে এটা কী করে সম্ভব যে, এমন বিশাল মর্যাদাসম্পন্ন ইমাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও তাঁর যুদ্ধের ধারাক্রম সম্পর্কে অজ্ঞ হন! অথচ তিনিই তাঁর যুদ্ধনীতি সম্পর্কিত ফেকাহর মাঝে এ জাতীয় ঘটনাবলির সাহায্যে নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন। এ বিষয়ে আমরা বিস্তর তর্কে না গিয়ে শুধু দু'টি গ্রন্থের নাম পেশ করছি। যে গ্রন্থদু'টি আলোচিত বিষয়বস্তুর ওপর ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ফিকাহ সম্পর্কে রচিত। ইসলামের যুদ্ধনীতি সম্পর্কিত এ দু'টি বইকে সারা বিশ্বের গুণীজন ইসলামি শরীয়তের অন্যতম সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ মনে করেন—

১. كتاب الرد على سير الأوزاعي। লেখক, ইমাম আবু ইউসুফ রহ.।

২. كتاب السير الكبير। লেখক, ইমাম মুহাম্মদ রহ.। ইমাম সারাখশী রহ. এর ওপর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামি ফিকাহর নীতিমালা সম্পর্কে এটি সবচেয়ে প্রাচীন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। বইটি جامعة الدول جمعية محمد بن الحسن الشيباني للحقوق الدولية العربية এর আগ্রহে এর পৃষ্ঠপোষকতায় মুদ্রিত হয়েছে।

মজার বিষয় হলো, ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কাছ থেকে শেখা বিদ্যা দিয়েই তাঁর যোগ্য শিষ্যগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত যতোগুলো ইসলামি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, সেগুলোর ধারাবাহিক বিবরণ সম্পর্কে এ দুটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন।

নিশ্চয়ই গোল্ড যেহের এ দু'টি বইয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবগত নয়। যদি সে সত্যসন্ধানী হতো তাহলে ইমাম আবু হানীফা রহ. নবীজির সীরাত জানতেন, কি জানতেন না— সে সম্পর্কে গোল্ড যেহের হায়াতুল হাওয়ান গ্রন্থে বর্ণিত দিময়ারীর বিচ্ছিন্ন বর্ণনার ওপর নির্ভর করতো না। গোল্ড যেহের খুব ভালো করেই জানে যে, দিময়ারী ব্যক্তিগতভাবে কোনো ঐতিহাসিক ছিলেন না। তার আলোচিত বইটি ফেকাহ বা ইতিহাস সংশ্লিষ্ট বই নয়। দিময়ারী বইটি লেখেছেন প্রাণীজগত সম্পর্কিত সকল ঘটনা ও বিরল তথ্যগুলো এক মলাটে একত্র করার লক্ষ্য নিয়ে। যার কারণে তিনি তথ্যগুলো সংগ্রহ করার সময় কখনই শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার বাছ-বিচার করেননি।

Scanned by CamScanner

গোল্ড যেহেরের মতো পণ্ডিত এ কথা অবশ্যই জানে যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সঙ্গে তার সমকালের কিছু জ্ঞানী ও পরবর্তীকালে সেই জ্ঞানীদের অনুসারীদের সঙ্গে চৈন্তিক ও তাত্ত্বিক বিতর্ক ছিলো। বিরল তথ্য সন্ধানী লেখক ও সাংবাদিকরা সেই বিতর্ক থেকে নানা চাঞ্চল্যকর খোরাক সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। সেখান থেকেই বিভিন্ন মুখরোচক গাল-গল্প জনতার মুখে মুখে রটেছে। এর মধ্যে কিছু গল্প এমন, যা ইমাম আবু হানীফা রহ.এর ব্যক্তিত্বকে অতিমানবীয় উচ্চতায় মেলে ধরেছে। আবার কিছু গল্প এমন, যেগুলো তার সফেদ পোশাকে কালিমা লেপনের চেষ্টা করেছে। বাস্তবতা হলো, এ ধরনের গল্পগুলোর সিংহভাগ লোকমুখে চর্চিত কল্পকাহিনী মাত্র। এগুলোর মধ্য হতে কিছু গল্প রটিয়েছে তার অন্ধভক্তের দল। আর কিছু গল্প ডাল-পালা ছড়িয়েছে শত্রুপক্ষের মাধ্যমে। যার কারণে গবেষক উলামায়ে কেরাম কখনই এগুলোকে গুরুত্ব দেননি। এগুলো কখনই তাদের কাছে জ্ঞান-সম্পদ মনে হয়নি।

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর জীবনালেখ্য সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যতোগুলো গবেষণালব্ধ সংকলন বেরিয়েছে, সেগুলোর একটির দিকেও গোল্ড যেহেরের দৃষ্টি নেই। তার চোখে একটি মিথ্যা বর্ণনাই সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য। অথচ বর্ণনাটি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর কাছেও মূল্যহীন হাস্যকর। প্রশ্ন হলো, গোল্ড যেহের কেন এমন কাজ করলো? এর একটাই উত্তর। তা হলো, সে আদাজল খেয়ে এ মিথ্যা দাবী প্রমাণিত করতে চাচ্ছে যে, হাদীস হলো হিজরী প্রথম তিন শতাব্দীর মুসলমানদের আবিষ্কার।

২.

মুসতাশরিকদের ভারসাম্যহীন নিক্তিতে জ্ঞানচর্চার আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তা হলো, জারাহ ও তা'দীল তথা হাদীসের শুদ্ধতা নিরীক্ষণ শাস্ত্রের সকল জ্ঞানী-গুণীগণ একবাক্যে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী রহ. (৫০-১২৪ হি.) কে নির্ভরযোগ্য হাদীসবেত্তা মনে করেন। এতদসংশ্লিষ্ট বই-পুস্তকে তার খোদাভীরুতা, বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা সম্পর্কে ভুরি ভুরি দলীল-দস্তাবেজ রয়েছে। বিস্ময়কর বিষয় হলো, প্রাচ্যবিদ সমাজ এ কথাগুলো মেনে নিতে নারাজ। তারা কিছুতেই তাকে সজ্জন মানতে প্রস্তুত নয়। তাদের দাবী হলো, তিনি উমাইয়া শাসকবর্গকে খুশি করতে

Scanned by CamScanner

জাল হাদীস বানাতেন। তিনিই আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে খুশি করার জন্যে لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الخ হাদীসটি তৈরি করেছেন। হাদীসটির ভাবার্থ হলো, মক্কার মসজিদুল হারাম, মদীনার মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা— শুধু এই তিন মসজিদ দেখতেই সফর করার অনুমতি রয়েছে।

তাদের দলীল হলো, হাদীসটি ইমাম যুহরী রহ. থেকে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সমবয়সী। আমি আমার লেখা السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। অধিকতর জানতে বইটির ৩৮৫ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো দেখুন।

৩.

প্রাচ্যবিদরা মুসলমানদের মাঝে একটি অন্তর্ঘাত ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে। তারা এ কথা ছড়িয়েছে যে, বিজয়ী আরবরা সবসময় অধীনস্থ অনারবদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করতো। তাদের প্রতি শ্রেণিগত বৈষম্য দেখিয়ে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। ব্রুকলিমান (Broclemann) তার تاريخ الشعوب الإسلامية গ্রন্থে লেখেছেন,

> 'যখন আরব জাতি শাসকরূপে আবির্ভূত হতে শুরু করে তখন তারা অনারবদেরকে দ্বিতীয় স্তরের গণ্য করতো। তাদেরকে رعية তথা 'পশুপাল' হিসেবে স্থান দিতো। যার বহুবচন হচ্ছে رعايا। তারা অনারবদেরকে এই বহুবচন শব্দেই সম্বোধন করতো। এটি হচ্ছে প্রাচীন সেমেটিক সামঞ্জস্য যা আসিরিয়ানদের সময়কাল পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ও ব্যবহৃত ছিলো।'

বিস্ময়ের বিষয় হলো, বিজয়ী মুসলমানদের আদালত ও সামাজিক আচার-আচরণে যে দৃষ্টান্তহীন সাম্য ছিলো, আরবরা যেভাবে জাত-পাতের ব্যবধান ঘুচিয়ে নিজ প্রজাদের সঙ্গে বৈষম্যহীন জীবনযাপন করতেন, তার ভুরি ভুরি দস্তাবেজ ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলিতে রয়েছে। কিন্তু ব্রুকলিমান সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। তার পূর্ণ মনোযোগ رعية শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণের ওপর। যার শাব্দিক অপব্যাখ্যা করে সে এ ফলাফল আবিষ্কার করেছে যে, আরব মুসলমানরা অনারবদের ছাগলের পালের মতো মনে করতো।

Scanned by CamScanner

অথচ শব্দটির উৎসমূল رعي শব্দ বোঝার জন্যে অভিধান গ্রন্থাবলির শরণাপন্ন হলে এমন আপত্তি ধোপে টিকবে না। যেমন, 'আল-কামুসুল মুহীত' অভিধানে এসেছে, راعي শব্দটি ব্যবহৃত হয় প্রতিটি গোত্রের অভিভাবক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে। জনগণকে বলা হয় رعية। رعيته শব্দের অর্থ, আমি তার সঙ্গে সদাচরণ করেছি। رَاعَيْتُ أَمْرَهُ বাক্যের অর্থ, আমি তার হিফাযত করেছি। তার তত্ত্বাবধান করেছি।

বুঝা গেলো, راعي শব্দের প্রয়োগ ছাগল পালের রাখাল ও তার রক্ষণা-বেক্ষণকারীর ওপর যেমন হয়, তেমনই গোত্রপতি ও জাতির অভিভাবকের ওপরও হয়। অদ্রূপ رعية শব্দের প্রয়োগ চতুষ্পদ জন্তুর ওপর যেমন হয়, তেমনই হয় জনগণ ও গোত্রের সদস্যদের ওপর। আর رعاية শব্দের অর্থ, হিফাযত, সংরক্ষণ ও সদাচরণ।

কাজেই যখন ইসলাম শব্দটিকে 'জাতি' অর্থে ব্যবহার করেছে, তখন তাকে স্রেফ 'অনারব' অর্থে বুঝে নেওয়া কখনই সঠিক নয়। এ শব্দ ব্যবহার করে আরবরা তাদেরকে 'বকরির পাল' বোঝাতো, এটাও ঠিক নয়। অসংখ্য প্রসিদ্ধ হাদীসে শব্দটি গোটা মুসলিম জাতির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্য হতে একটি হাদীস আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। হাদীসটি ইমাম বুখারী সহ অন্যান্য হাদীস বিশারদগণ নকল করেছেন যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন,

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'খবরদার! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা তার জনগণের ব্যাপারে যিম্মাদার। তাকে তার এই যিম্মাদারির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের সদস্যবর্গের ওপর

Scanned by CamScanner

যিম্মাদার। তাকে তার যিম্মাদারি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার স্বামীর ঘরের সদস্যদের ও তার সন্তানদের ব্যাপারে যিম্মাদার। তাকে এই দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। ভৃত্য তার প্রভুর সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকেও তার এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মনে রেখো! তোমরা প্রত্যেকেই যিম্মাদার। প্রত্যেককেই নিজ নিজ যিম্মাদারির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।'

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীর ১৩ নম্বর খণ্ডের ১৬ নম্বর পৃষ্ঠায় এ হাদীসের ব্যাখ্যা করে লেখেন,

والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه

راعي বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যিনি আমানতদার, অভিভাবক, নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে দায়িত্বপালনে অভ্যস্ত হন। তাকে যে সব বিষয় রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় সেগুলো পূর্ণ দায়িত্ববোধের সঙ্গে সংরক্ষণ করেন। তার কাছে এ প্রত্যাশা থাকে যে, সে ন্যায়-নিষ্ঠা ও কল্যাণকামিতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে।'

অন্য এক হাদীসে رعيت শব্দটি সকল মুসলমানের ওপর ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসটি ইমাম বুখারী সহ অপরাপর মুহাদ্দিসীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

'যে নেতা মুসলমান জনগণের অভিভাবকের পদে নিয়োজিত রয়েছে যদি সে এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তাদের ক্ষেত্রে সে দায়িত্বপালনে ত্রুটি ও অবিশ্বস্ত ছিলো তাহলে আল্লাহ তার জন্যে জাহান্নাম হারাম করবেন।'

Scanned by CamScanner

তাজ্জব লাগে, কীভাবে ব্রুকলিমান অন্ধের মতো এই বিষয়গুলো থেকে চোখ বন্ধ করে রাখলো! নিজের জ্ঞানস্বল্পতার ভিত্তিতে কী করে সে এ দাবী তোলার সাহস পেলো যে, আরব মুসলমানরা স্রেফ অনারব মুসলমানদেরকেই বকরির পাল মনে করতো! এবং শুধু তাদের ক্ষেত্রেই এই বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করতো!

رعيت শব্দটি শুধু বকরির পাল অর্থেই ব্যবহৃত হয়, এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ বা সনদ আদতে ব্রুকলিমানের কাছে নেই। অথচ তার শাব্দিক অর্থ কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। দ্বিতীয় কথা হলো, 'এ শব্দটি শুধু অনারবদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতো, তার এই দাবীর স্বপক্ষেও তার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। প্রমাণ তো পরের কথা, ধারণামূলক উক্তিও নেই। বুঝা গেলো, তার এই তত্ত্ব শতভাগ প্রবৃত্তিতাড়িত ও স্বার্থপ্রসূত আবিষ্কার।

৪.

প্রাচ্যবিদ 'ম্যূর' এ দাবী তুলেছে যে, মরুচারী আরবরা আরবি ভাষার সাহিত্য, অলঙ্কার ও বাগ্মিতার নিপুন চর্চা করতো। কাজেই এটা অসম্ভব নয় যে, নবী মুহাম্মদ (সা.) তাদের কাছ থেকেই এ শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং নিজেকে অত্যুচ্চ উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।' এমন কিছু কথা তার থেকে অপর প্রাচ্যবিদ 'মারজিলিউস' নকল করেছেন।

শুনতে ভালো লাগবে যে, এই দৃষ্টান্তগুলোই আমাদের সামনে এ কথা স্পষ্ট করে যে, প্রাচ্যবিদদের গবেষণা ও নিরীক্ষণের মাপকাঠি ভারসাম্যপূর্ণ নয়। তারা স্রেফ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে অনেক তত্ত্ব উদ্ভাবন করতে পারে। অথচ বাস্তবতার সঙ্গে সেই অনুমানের লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। কেননা আরবদের মাঝে সাহিত্য শেখা-শেখানোর প্রচলন ছিলো না। ওই যুগে এমন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ছিলো না। এমন কোনো শিক্ষাগুরু ছিলো না, যারা সাহিত্য ও অলঙ্কারের নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করবেন। এমনকি নবুওয়াতের পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো কাছে সাহিত্য শিখেছেন, এর স্বপক্ষে কোনো ছোটখাট ঐতিহাসিক বর্ণনাও নেই।

ম্যূর তার এই দাবীর স্বপক্ষে কোনো দুর্বল প্রমাণও হাজির করতে পারেনি। বরং ঐতিহাসিকভাবে এ কথা প্রমাণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Scanned by CamScanner

ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভের পূর্বে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগে কারো থেকে, বা কারো সূত্রে কোনো পদ্য, বা গদ্য নকল করেননি।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করুন। প্রাচ্যবিদরা যে কানা চোখে ইসলাম পড়তো এবং তাদের এ সম্পর্কিত গবেষণাগুলো যে তৃতীয় স্তরের মাপকাঠি অনুসারে হতো, তা আপনাদের কাছে আশা করি স্পষ্ট হবে। তা হলো, তারা সবসময় কারণ উদ্‌ঘাটন, উৎস নিরুপণ ও ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘণ করে থাকে। এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে তারা কখনই দলীল-দস্তাবেজের ধার ধারে না। সবসময় নিজেদের মনগড়া তত্ত্ব নিয়ে হাজির হয়।

তাদের এই সীমালঙ্ঘণ ও অতিরঞ্জনের পরিমাণ ওই সময় খুব বেশি বেড়ে যায় যখন তারা প্রাচ্য ও আরব মুসলমানদের ঘটনাবলি, জীবনধারা ও নীতি-নৈতিকতাকে তাদের পশ্চিমা কল্পকথা ও অনুমান দিয়ে বিচার করতে বসে। প্রাচ্যবিদরা কখনই এ কথা স্বীকার করে না যে, প্রতিটি পরিবেশের নিজস্ব অভিরুচি, অভ্যাস ও একান্তই সবিশেষ মাপকাঠি থাকে।

ফরাসি মুসলিম প্রাচ্যবিদ 'নাসিরুদ্দীন ডেনিয়া' ওরিয়েন্টালিস্টদের স্বভাব ও তাদের গবেষণার মাপকাঠি সম্পর্কে আলোচনার সময় কিছু চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কোন নীতির আলোকে তারা বস্তুর বিধান নির্ণয় করে। মাপকাঠির এই অরাজকতাই তাদের পরস্পরে তুমুল ঝগড়া ও অমীমাংসা সৃষ্টি করে। এর নেপথ্যে একটি বড় কারণ হলো, তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস ইউরোপিয়ান মস্তিষ্ক দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করেছে। যার কারণে তারা এক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গ পায়নি এবং বড় বড় ভুলের শিকার হয়েছে। কারণ, সীরাতে রাসূল ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস এমন যে, তা পশ্চিমা চোখ দিয়ে দেখতে গেলে কখনই বাস্তবাশ্রিত হবে না। আর ইউরোপিয়ান বাকশক্তি কখনই প্রাচ্যের নবীদের ইতিহাস সম্পর্কে যথাযথ পরিণতিতে উপনীত হতে পারবে না।

নাসিরুদ্দীন ডেনিয়া এরপর লেখেন যে, 'ওই প্রাচ্যবিদরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের ওপর নিরেট ইউরোপিয়ান পদ্ধতিতে সমালোচনার ক্ষেত্র তৈরি করার জন্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে পৌনে শতাব্দীর

Scanned by CamScanner

অধিককাল গবেষণা চালিয়ে যায়। তারা এ ব্যাপারে প্রাণান্ত চেষ্টা করেছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান নবীচরিতের যেই বিষয়গুলোর ওপর একমাত্র তারা সেগুলোকে ভেঙে-চুরে একাকার করে ফেলবে। তাদের এই দীর্ঘ অধ্যবসায় ও শেকড়-স্পর্শী সাধনার পরিমাণ এতো বেশি ছিলো, সেগুলোর ঝড়ে নবীজির সীরাতের স্বতসিদ্ধ বিষয়গুলো ধসে পড়াই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু বলুন, তারা কি তাদের এই মিশনে যৎকিঞ্চিৎ সফল হতে পেরেছে?

আমি জানি, এই প্রশ্নের একটাই উত্তর। তা হলো, তারা নবীজির সীরাতের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর দোষও প্রমাণিত করতে পারেনি। বরং আমরা যখন ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি, বেলজিয়া ও হল্যান্ড-সহ অপরাপর দেশগুলোর ওরিয়েন্টালিস্ট মহল কর্তৃক প্রদত্ত নতুন নতুন তত্ত্বগুলো গভীরভাবে নিরীক্ষণ করি তখন সেখানে ভুল ও সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ব্যতিরেকে নতুন কোনো কিছুই পাই না। বরং আপনি তাদের প্রত্যেককেই দেখতে পাবেন যে, সে এমন কোনো বিষয় প্রমাণিত করার পেছনে তার নিজের পূর্ণ শক্তি ও শ্রম ব্যয় করছে, খোদ যে বিষয়টিকেই অন্য কোনো প্রাচ্যবিদ নাকচ করে দিয়েছে, অথবা সে নিজেই তার একটু আগে দাবী করা তত্ত্ব ও চিন্তাধারা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে।

এরপর ডেনিয়া এ ধরনের কয়েকটি পারস্পরিক সাংঘর্ষিক গবেষণার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। তিনি তার এই মূল্যবান আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে এ কথা বলেন যে,

> 'ওই সূক্ষ্মদর্শী প্রাচ্যবিদরা তাদের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের মাঝে যেই পারস্পরিক সাংঘর্ষিক মতবাদ নিয়ে পরস্পরে টানাহেঁচড়ার কাজ করেছে আমরা যদি তার সবগুলো নযির উপস্থাপন করতে শুরু করি তাহলে প্রচুর সময় ও প্রচুর কাগজ লেগে যাবে। খোদ আমাদের কাছেই তখন তালগোল বেঁধে যাবে যে, প্রকৃত বাস্তবতা কোনটি? কাজেই এখন আমাদের সামনে খোলা পথ একটাই। তা হলো, আমাদেরকে সেই সীরাতেরই শরণাপন্ন হতে হবে, যা আরব লেখকরা লেখেছেন।
>
> যে সকল লেখক এ দাবী করে যে, তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও জীবনালেখ্যের ওপর

Scanned by CamScanner

বৈজ্ঞানিক ও সাইন্টিফিক পদ্ধতিতে গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণ করছে, মজার বিষয় হলো– তারা স্রেফ একটি তত্ত্বের ওপরও একমত হতে পারেনি। অন্য বিষয়গুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম। যদিও তাদের ভাষায় তারা গবেষণা, অনুসন্ধান ও তাদের ভাষায় 'মুখোশ উন্মোচনের' যথাসাধ্য কসরত চালিয়েছে। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেনি। আগামীতে পৌঁছবে না।

হ্যাঁ, তারা অবশ্যই ওই সীরাতের এমন কিছু বীর চরিত্রকে বীর হিসেবে উপস্থাপন করতে পেরেছে, যারা বাস্তবে 'ফিল্টার স্কট' ও 'সেকান্দার থমাস' এর বীরসুলভ অবদানের অধিক তাৎপর্য রাখে না। এ সকল গল্পবাজ লেখক স্বজাতির এমন কয়েক সদস্যকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছে, যাদেরকে তারা ভালোভাবে জানতে পেরেছে। তারা এক্ষেত্রে সময়ের দূরত্ব ব্যতিরেকে অন্য কোনো ব্যবধান দেখেনি।

প্রাচ্যবিদ সমাজ এ কথা ভুলে গিয়েছিলো যে, সর্বাগ্রে তাদের দায়িত্ব ছিলো সেই শূন্যস্থান পূরণ করা যা তাদের পশ্চিমা মস্তিষ্ক ও ওই-সব প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান, তারা যাঁদের জীবনীগ্রন্থ লেখছে। যদিও তারা এই শূন্যস্থান পূরণ না করে এগুনোর চেষ্টা করে তাহলে বাস্তবতা হলো, তারা প্রতিটি পয়েন্টে বিভ্রান্তির শিকার হবে।'

Scanned by CamScanner



পশ্চিমা প্রাচ্যবিদদের মুখোমুখি

১.

১৯৫৬ সালে আমি ইউরোপে গিয়েছি। সেখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি। সেগুলোর পরিচালকবর্গের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করেছি। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের যুক্তি-পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন হয়েছে। কিন্তু এর আগেই আমি আমার السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي এর মাঝে মুসতাশরিকদের সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নোট লিখেছিলাম।

কিন্তু যখন তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত ও মতবিনিময় হয় তখন ইতোপূর্বে তাদের সম্পর্কে যা যা লিখেছিলাম, তার প্রতি আমার বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। আমাদের ইসলামি ঐতিহ্য– চাই তার সম্পর্ক শরীয়তের সঙ্গে হোক, অথবা আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে হোক, সেই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ইসলামি ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার ইতোপূর্বে ব্যক্ত করা আশঙ্কাগুলো আরও তীব্র হয়ে ওঠে। কারণ, আমি দেখেছি– তাদের অন্তর ইসলাম, আরব ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও উগ্রতায় টইটুম্বর।

সর্বপ্রথম আমি সাক্ষাত করি প্রফেসর এন্ডারসনের সঙ্গে। যিনি লন্ডন ইউনিভার্সিটির প্রাচ্যবিষয়ক গবেষণা অনুষদের শাখা মুসলিম পারসোনাল ল' অব ইসলামিক ওয়ার্ড এর প্রধান। ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিসরে বৃটিশ সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি আমাকে তার নিজের ব্যাপারে এ তথ্য দিয়েছেন যে, যখন আযহারের কয়েকজন শিক্ষক কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে প্রতি সপ্তাহে মাত্র এক দিন এক ঘণ্টা করে আরবি ভাষা শেখাতেন, সেই এক বছরের কোর্সে

Scanned by CamScanner

অংশগ্রহণ করেই তিনি আরবি ভাষা শিখেছেন। আর মিসরের স্থানীয় ভাষা শিখেছেন মিসরের জনগণের সঙ্গে মিলে-মিশে, যখন তিনি সেখানে সেনাবাহিনীর কর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। ইসলামের ওপর তিনি বিশেষ শিক্ষা অর্জন করেছেন ডক্টর আহমদ আমীন, ডক্টর তোয়াহা হুসাইন ও শায়খ আহমদ ইবরাহীম প্রদত্ত লেকচার থেকে। যুদ্ধের পর তিনি সেনাবাহিনীর পদ থেকে ইস্তফা দেন। যোগদান করেন লন্ডনের এই মুসলিম পারসোনাল ল বিষয়ক শাখা অনুষদে। যার কথা আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি।

ইসলামের বিরুদ্ধে তার সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির ইতিহাস এতো দীর্ঘ যে, আমি তা এখানে উপস্থাপন করে কালক্ষেপন করতে চাচ্ছি না। তার ব্যাপারে ডক্টর মাহমুদ গরাবাহ আমাকে অনেক তথ্য ওই সময় জানিয়েছেন, যখন তিনি লন্ডনের 'মারকাযে সাকাফাতে ইসলামি' এর পরিচালক ছিলেন।

এ মুহূর্তে আমি শুধু সে কথাগুলোই বলবো, যা এন্ডারসন নিজেই আমাকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আযহারের এক শিক্ষার্থীর ইচ্ছে ছিলো, সে লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামি শরীয়তের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করবে। সে ইসলামে নারীর অধিকার বিষয়ে তার অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করে। যার মাঝে সে এ কথা প্রমাণিত করেছে যে, ইসলাম নারীকে তার প্রাপ্য সকল অধিকার প্রদান করেছে। আমি ওই ছাত্রটিকে অকৃতকার্য করে দিয়েছি। তাকে ডক্টরেট ডিগ্রি সংগ্রহ করতে দিইনি।

এন্ডারসনের এ কাজের ওপর আমার চরম বিস্ময় হলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন ছেলেটিকে ফেল করালেন? কেন তাকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করার সুযোগ দিলেন না? অথচ আপনারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে চিন্তার স্বাধীনতা ও উদারতার জাবড় কাটেন!!

উত্তরে তিনি বলেন, 'ছেলেটিকে অকৃতকার্য সাব্যস্ত করার কারণ হলো, সে তার অভিসন্দর্ভে এ কথা লিখেছে যে, ইসলাম নারীকে এটা দিয়েছে! ইসলাম নারীর জন্যে ওটা বরাদ্দ করেছে! প্রশ্ন হলো, এ ছেলেটি কি ইসলামের সরকারি মুখপাত্র? সে কি আবু হানীফা ও শাফেয়ীর মতো ইসলামবেত্তা যে, ইসলামের মুখপাত্রের ভূমিকায় নেমে এসেছে? নারী

Scanned by CamScanner

অধিকার সম্পর্কে সে যেই থিউরি পেশ করেছে, এর স্বপক্ষে ইসলামের প্রাচীন ফকিহদের কোনো নির্ভরযোগ্য ভাষ্য নেই। যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, সে আবু হানীফা ও শাফেয়ীর চেয়ে ইসলাম সম্পর্কে বেশি জানে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে অহঙ্কারী ও দেমাগি।'

এ কথাগুলো বলেছে এমন এক প্রাচ্যবিদ যে এখনও বেঁচে আছে। আমি জানি না, সে এখন কোনো পোস্টে আছে, না অবসরে গেছে।

২.

আমি স্কটল্যান্ডের এডিনবরা ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি। সেখানকার ইসলামি গবেষণা বিভাগের প্রধান হিসেবে একজন পাদ্রী ওরিয়েন্টালিস্ট দায়িত্ব পালন করছিলেন। লোকটি আধুনিক পোশাক পরিহিত ছিলো। তার ঘরের দরোজার ওপর যেই নেমপ্লেট সাঁটা আছে সেখানে তার নামের সঙ্গে তার ধর্মীয় পদবি লেখা ছিলো।

৩.

স্কটল্যান্ডের আরেকটি বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপীঠ হচ্ছে গ্লাস্কো ইউনিভার্সিটি। এখানকার এরাবিক গবেষণা বিভাগের প্রধানও একজন পাদ্রী। লোকটি কুদস নগরীতে প্রায় ২০ বছর খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থার পদে কর্মরত ছিলো। পুরোপুরি আরবদের মতো আরবিতে কথাবার্তা বলছিলো। সাক্ষাতপর্বে সে আমাকে তার ব্যক্তিগত অনেক কথা জানিয়েছে। ইতোপূর্বে তার সঙ্গে একটি ঈসায়ি-ইসলামি কনফারেন্সে সাক্ষাত হয়েছিলো। যা ১৯৫৪ সালে লেবাননের 'মাহমাদুন' নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়।

৪.

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে 'এরাবিক এন্ড ইসলামিক স্টাডি' অনুষদের এক ইয়াহুদি প্রধানের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে। লোকটি বেশ ধীরে ধীরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবিতে কথা বলতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সে লিবিয়াতে বৃটিশ ইন্টালিজেন্সের একটি শাখায় কাজ করেছে। সেখান থেকেই সে স্থানীয় আরবি ভাষা শেখে। এরপর সে মাতৃভূমি ইংল্যান্ডে ফিরে আসে এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এই শাখাটির প্রধানের দায়িত্ব পেয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

আমি তার ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সে তখন প্রাচ্যবাদ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদেরকে পড়াচ্ছিলো। মজার বিষয় হলো, আমি দেখলাম– সে কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর করছে যামাখশারীর লেখা 'কাশশাফ' গ্রন্থ থেকে। অথচ তার আরবি ভাষা-জ্ঞান এতোটাই স্বল্প যে, সাধারণ পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের অতি সহজ আরবিও সে ঠিকমতো পড়তে পারে না, বুঝতে পারে না। অথচ বুখারী-মুসলিম-সহ হাম্বলী ও হানাফী মাযহাবের বড় বড় ফিকহি কিতাবাদি থেকে বিভিন্ন অধ্যায় পড়াচ্ছে। তার এ কাজে আমি বিস্মিত হলাম। আমি তখন তাকে এই স্টাডির উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। উত্তরে সে জানালো যে, গোল্ড যেহের, মার্জিলিউস ও যোসেফ স্কচের মতো প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থাবলি তার এই স্টাডির উৎস।

তার উচ্চারিত প্রাচ্যবিদদের নাম শুনেই বুঝতে পেরেছি যে, তার পাঠদানের গতিমুখ কোন দিকে। যারা নিজেদের রচনাবলিতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবিরত বিষ ছড়াচ্ছে, তাদের বই যাদের স্টাডির উৎস, তাদের পাঠদানের পরিণতি সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

৫.

ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির ইসলামিক এন্ড এরাবিক স্টাডি অনুষদের প্রধান হচ্ছেন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ এ. জে. আরবারি (A. J. Arberry)। তিনি আরবি ভাষার ওপর ডক্টরেট করেছেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বলেছেন যে, 'ইসলাম সম্পর্কে আমাদের গবেষণামূলক কাজগুলোতে প্রচুর বিচ্যুতি ঘটে। যার কারণে এই ময়দানে আমাদের অবতরণ না করাই সমীচিন। কেননা এ জাতীয় আলোচনার জন্যে আরব মুসলমানরা আমাদের চেয়ে অধিক যোগ্য।' আমি জানি না, তিনি কি কথাগুলো আন্তরিক বিশ্বাস থেকেই বলেছেন, না ভদ্রতার ছদ্মাবরণে পেশ করেছেন!

৬.

ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে প্রফেসর রোবোসন এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তিনি সুনানে আবু দাউদের একটি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মুদ্রিত কপির নিরীক্ষণের কাজ করছিলেন। তিনি ইতিহাসের ওপর প্রচুর

Scanned by CamScanner

লেখালেখি করেছেন। অধিকাংশ স্থানে তার লেখাগুলো ওরিয়েন্টালিস্টদের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত। আমার ইচ্ছে হয়েছিলো তাকে এ কথা বলবো যে, পূর্বের প্রাচ্যবিদদের লেখার মাঝে সততার অভাব প্রকট। যত্রতত্র মিথ্যা ও বিকৃতির ছড়াছড়ি। আমি আমার ইচ্ছেটাকে দমিয়ে রাখতে পারলাম না। গোল্ড যেহেরের চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা তুললাম এবং তার ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভুলগুলো প্রমাণ সহকারে মেলে ধরলাম। তখন সে আমাকে এ উত্তর দিলো যে, 'বর্তমান যুগের প্রাচ্যবিদরা গোল্ড যেহেরদের তুলনায় ইসলামি উৎসগ্রন্থ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞানের অধিকারী। কারণ, যেই ইসলামি বইগুলো গোল্ড যেহেরদের যুগে দুষ্প্রাপ্য ছিলো, এখন সেগুলো প্রকাশিত হয়ে হাতে হাতে চলে এসেছে।' আমি তাকে বললাম, 'আমি কি এ আশা করতে পারি যে, এ যুগে আপনার প্রজন্মের প্রাচ্যবিদদের আলোচনাগুলো গোল্ড যেহের, মার্জলিউস-সহ পূর্বেকার প্রাচ্যবিদদের তুলনায় ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ হবে'?! উত্তরে তিনি বললেন, 'আমিও এমনটার আশাবাদী'।

৭.

নেদারল্যান্ডের লিডেন বিশ্ববিদ্যালয় (Leiden University) এর যোসেফ স্কচ (Joseph Schecht) এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে। লোকটি জার্মান ইয়াহুদি ওরিয়েন্টালিস্ট। ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাবের জন্যে প্রসিদ্ধ। যার সার্বক্ষণিক মিশন হলো, ইসলামের শুভ্র বদনে কালিমা লেপন করার জন্যে সব ধরনের বিকার-বিকৃতির আশ্রয় নেওয়া। তাকে এ যুগের গোল্ড যেহের বললে ভুল হবে না। বা গোল্ড যেহেরের এ যুগের মুখপাত্র ও প্রচারকও বলা যেতে পারে।

আমি তার সঙ্গে দীর্ঘ-ক্ষণ গোল্ড যেহেরের বিকৃতির অপপ্রয়াস সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমি তাকে দেখিয়েছি— কীভাবে সে আমাদের বই-পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি নকল করার সময় বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে।

প্রথম দিকে সে আমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করে। কিন্তু যখন আমি তার সামনে একটি উদাহরণ দিই যা গোল্ড যেহের তার كتاب السنة গ্রন্থে লেখেছে তখন সে ভীষণ বিস্মিত হয়। তার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হচ্ছিলো তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে। সে তৎক্ষণাৎ গোল্ড যেহেরের বইটির

Scanned by CamScanner

শরণাপন্ন হয়। দেখার পর সে এ কথা স্বীকার করে যে, আপনি সত্য বলেছেন। এখানে গোল্ড যেহের ভুল করেছেন।

আমি তখন তাকে বললাম, সে কি শুধু এমন এক ভুলই করেছে? সঙ্গে সঙ্গে সে তেঁতে ওঠলো। ভেতরের বিদ্বেষ উগড়ে দিয়ে বললো, 'আপনারা কেন গোল্ড যেহেরের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করেন!'

তখন আমি বিশদ প্রসঙ্গ তুললাম। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সঙ্গে ইমাম যুহরীকে জড়িয়ে গোল্ড যেহের যেই অবান্তর দাবী তুলেছে, সে প্রসঙ্গের ওপর আলোকপাত করলাম। পাশাপাশি সেই ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলোও মেলে ধরলাম, যার আলোকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যুহরী সম্পর্কে গোল্ড যেহেরের দাবীগুলো অবাস্তব ও মিথ্যাচার।

এ বিষয়ে আমার সঙ্গে দীর্ঘ তর্কের পর যোসেফ স্কচ ভুল স্বীকার করে বললো, এক্ষেত্রেও গোল্ড যেহেরের ভুল হয়ে গেছে। এমন ভুল কি মুসলিম আলেমদের হয় না?

উত্তরে আমি তাকে বললাম, 'গোল্ড যেহের হলো এই প্রাচ্যতত্ত্ব চর্চার বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা। এই বিদ্যাপীঠগুলোর কর্মসূচি হলো, ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের আলোকে ইসলামি শরীয়ত গভীরভাবে নিরীক্ষণ করা। যুহরীর ওপর অভিযোগ তোলার সময় গোল্ড যেহের কেন সেই মাপকাঠি ও উৎসমুখ ব্যবহার করলেন না? তার জন্যে যুহরীর বিরুদ্ধে এই অপবাদ আরোপ করাটা কীভাবে বৈধ হলো যে, তিনি ইবনুয যোবায়েরের বিরুদ্ধে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে খুশি করার জন্যে মসজিদে আকসার ফযীলত সম্বলিত জাল হাদীস তৈরি করেছেন? অথচ এ কথা সবাই জানে যে, আবদুল মালিকের সঙ্গে ইমাম যুহরীর সাক্ষাত হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের রাদি.-এর ইনতিকালের কয়েক বছর পর?

এ কথা শুনে স্কচের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। সে এক মুষ্ঠির ভেতর অন্য মুষ্ঠি কচলাতে লাগলো। চেহারার ওপর ক্রোধ ও অস্থিরতার আলামত ফুটে উঠলো। আমি তখন এ কথা বলে আলোচনার পরিসমাপ্তি টেনে ধরলাম যে, 'আপনি আজ যাকে 'ভুল' নাম দিয়েছেন, বিগত শতাব্দীতে সেটাই চর্চাবহুল ছিলো। আপনারা একজন প্রাচ্যবিদ অন্য প্রাচ্যবিদ থেকে এগুলোকে 'জ্ঞানতত্ত্ব' হিসেবেই আনা-নেওয়া করতেন। আমরা মুসলমানরা

Scanned by CamScanner

এগুলো পড়ার সুযোগ পেয়েছি সেগুলোর লেখকদের মৃত্যুর পর। কাজেই এখন আমরা আশা করবো, আপনারা আপনাদের ভুলসমূহের ব্যাপারে আমাদের সংশোধনীগুলো পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে শুনবেন। এগুলো যেন 'জ্ঞানতত্ত্ব' হিসেবে গেড়ে না বসে, তার আগেই আপনারা আপনাদের জীবদ্দশায় সেগুলো শুদ্ধ করে নেবেন।

মজার বিষয় হলো, এ লোকটি কায়রো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলো। ইসলামি শরীয়তের ইতিহাসের ওপর তার একটি বই রয়েছে। লোকটি তার গুরু গোল্ড যেহেরের যথোপযুক্ত শিষ্য। গুরুর বইগুলোর মতো তার বইগুলোও বিকৃতি ও অসততায় টইটুম্বর।

৮.

সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় (Uppsala University) এ প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক নিবার্জের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছিলো। তিনি সম্ভবত ইবনে খাইয়্যাতের الانتصار গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। যা কায়রোর لجنة التأليف والترجمة অনেক দিন আগে প্রকাশ করেছে।

তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপচারিতা হয়। প্রাচ্যবিদ মহল এবং তাদের ইসলাম ও এর ইতিহাস সম্পর্কিত রচনাবলি নিয়েই অধিক কথাবার্তা হয়েছে। তার সামনে আমি গোল্ড যেহেরের বিষয়টি তুলে ধরি। উদ্ধৃতি নকল করার সময় তার বিকৃতি ও ইচ্ছাকৃত প্রমাদের কিছু দৃষ্টান্ত সম্পর্কে আলোকপাত করি। আমার এ কথার উত্তরে সে বলে যে, গোল্ড যেহেরকে বিগত শতাব্দীতে প্রাচ্যবিদদের শিক্ষাগুরু মনে করা হতো। তার সুনাম-সুখ্যাতি ওই শতাব্দীতেই ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়েছিলো। কিন্তু বর্তমান যুগে যেহেতু ইসলামের বিভিন্ন শাস্ত্রের ওপর তোমাদের দেশে প্রচুর কিতাবাদির বিস্তার ঘটেছে, যার কারণে এখন আর গোল্ড যেহেরের সেই মর্যাদা নেই যা বিগত শতাব্দীতে ছিলো। আমার দৃষ্টিতে সে একটি অতিক্রান্ত অধ্যায় মাত্র।

ইউরোপের এই দীর্ঘ ভ্রমণে আমি আলোচিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাড়াও বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ও প্যারিসের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি। এসব শীর্ষ বিদ্যাপীঠে কর্মরত ওরিয়েন্টালিস্টদের সঙ্গে আমার মতবিনিময়ের সুযোগ হয়েছে।

Scanned by CamScanner

এ সফরে আলোচিত প্রাচ্যবিদদের সঙ্গে সাক্ষাত ও তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের পর আমার চোখে যে বিষয়গুলো ধরা পড়েছে, তা সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি–

১. প্রাচ্যবিদরা সাধারণত পাদ্রী হয়ে থাকেন। নয়তো সাম্রাজবাদী, অথবা ইয়াহুদি। এই তিন শ্রেণির বাইরে প্রাচ্যবিদের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল।

২. সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর তুলনায় অসাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে প্রাচ্যবাদ চর্চা অপেক্ষাকৃত কম ও দুর্বল।

৩. বর্তমান যুগে অসাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে যেসকল প্রাচ্যবিদ রয়েছেন, তাদের মাঝে গোল্ড যেহের বা এ জাতীয় উগ্র ইসলাম বিদ্বেষীদের মতো গোঁড়ামি নেই।

৪. ইসতিশরাক মূলত গির্জা থেকে সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে গির্জা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে। এ দু'টি সবসময় একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে।

৫. সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স এখনও ইসতিশরাকের চর্চা প্রাচীন পদ্ধতিতে চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক। কারণ, এটি ইসলামকে ধ্বংস করা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুর্নাম ছড়ানোর কার্যকর হাতিয়ার।

তাইতো দেখা যায়, ফ্রান্সে এখনও 'ব্লাশির' ও 'মেসিনিউন' নামে এমন দু'জন ফরাসি ওরিয়েন্টালিস্ট রয়েছেন— যাদেরকে ফরাসি ওরিয়েন্টালিস্টরা এ যুগের শিক্ষাগুরু মনে করে থাকে। এরা দু'জন ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আরব ও মুসলমান বিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ইংল্যান্ডে আমি দেখেছি— সেখানকার শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, বিশেষত অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, এডিনবরা ও গ্লাস্কো ইউনিভার্সিটিতে 'ইসতিশরাক বিভাগ'-কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষদ মনে করা হয়। যেমনটি আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এই অনুষদগুলোর শীর্ষপদে অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণার অধিকারী কোন না কোন ইয়াহুদি বা ইংরেজ খ্রিস্টান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছে। এ সকল উপদেষ্টার একান্ত ইচ্ছে হলো, ইউরোপের যে সকল শিক্ষার্থী 'প্রাচ্যবাদ' এর ওপর পড়াশুনা করতে চায়, বা যেসকল আরব কিংবা মুসলমান ডক্টরেট ডিগ্রি নেওয়ার

Scanned by CamScanner

জন্যে এখানে এসেছে, তাদেরকে যেন অবশ্যই গোল্ড যেহের, মার্জিলিউস ও যোসেফ স্ক্যাচের বই পড়ানো হয়। তাদেরকে যেন এ কথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, প্রাচ্যবাদ শাস্ত্রে এদের বইগুলোই উৎসগ্রন্থ। এ সকল উপদেষ্টা কখনই এমন কোনো অভিসন্দর্ভকে অনুমোদন দেয় না, বা তার লেখককে কৃতকার্য হিসেবে ঘোষণা করে না যেই অভিসন্দর্ভে ইসলামের সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করে ওই-সব প্রাচ্যবিদের বিষাক্ত থাবার ষড়যন্ত্র ফাঁস করা হয়েছে।

ডক্টর আহমদ আমীন মিসরি— যিনি আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বীনিয়াত অনুষদ থেকে এবং কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের كلية الأدب ومعهد التربية থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। তিনি যখন ইংল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করার জন্যে ফিলোসফি বিষয়ক একটি অভিসন্দর্ভ পেশ করেন, তখন ওই অভিসন্দর্ভের জন্যে তাকে যথেষ্ট ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়েছিলো। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি ফিলোসফির ওপর উচ্চ শিক্ষা অর্জন ও ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করার জন্যে কয়েক বছর আগেই বিলাত গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি স্ট্যাডির যতোগুলো প্রোগ্রাম দেখেছেন, বিশেষত ইসলামি জ্ঞান-ভাণ্ডারের ওপর যতোগুলো অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন, সেগুলোতে তিনি ওরিয়েন্টালিস্টদের অসততা, প্রতারণা ও শঠতার নির্বিকার প্রকাশ দেখে অবাক হয়েছেন। বিশেষত যোসেফ স্ক্যাচের বইগুলো দেখে প্রচণ্ড বিস্ময়ে তার কপাল কুচকে ওঠে।

যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, স্ক্যাচের লেখা تاريخ الفقه الإسلامي এর অপনোদনে তিনি একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখবেন এবং এটাই হবে তার ডক্টরেটের অভিসন্দর্ভ। সেই ভাবনা থেকেই তিনি প্রফেসর এন্ডারসনের কাছে আসেন এবং তাকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন এই অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে তাকে সহায়তা করেন এবং এ কাজের উপদেষ্টা হতে সম্মতি জানান।

বিস্ময়ের বিষয় হলো, এন্ডারসন তার সেই প্রস্তাবনা নাকচ করে দেয়। সে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, স্ক্যাচের সমালোচনামূলক কোনো প্রসঙ্গ তার অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য হতে পারবে না। আসলে এ সব বিষয়ে তার সম্মতি চাওয়া অর্থহীন প্রয়াস মাত্র।

Scanned by CamScanner

ডক্টর আহমদ আমীন লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে নিরাশ হয়ে চলে আসেন ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে। সেখানকার ইসলামিক স্ট্যাডিজের বিভিন্ন প্রাচ্যবিদ উপদেষ্টার কাছে এ অনুরোধ ব্যক্ত করেন যে, তাকে যেন উপরিউক্ত প্রতিপাদ্যের ওপর অভিসন্দর্ভ লেখার অনুমতি দেওয়া হয়। তারাও তার এই অনুরোধের ওপর জল ঢেলে দিয়ে তাদের অসম্মতি প্রকাশ করে।

ডক্টর আহমদ আমীন সাহেব ভেবেছিলেন, হয়তো তার শেষ পর্যন্ত সম্মত হবে। এ জন্যে উপর্যুপরি অনুরোধ ব্যক্ত করেন; কিন্তু তারা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয় যে, যদি তুমি সফলতার সঙ্গে ডক্টরেট সম্পন্ন করতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই স্ক্যাচের সমালোচনার খায়েশ ত্যাগ করতে হবে। কেননা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কখনই এর অনুমতি দেবে না। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তখন তার অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু চয়ন করেন معايير نقد الحديث عند المحدثين। [হাদীসবিশারদদের মতে হাদীস নিরীক্ষণের বিভিন্ন মাপকাঠি]। তারা এই বিষয়বস্তুর ওপর ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ সম্মতি জ্ঞাপন করে। এভাবে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। বর্তমানে আহমদ আমীন সাহেব দামেশক ইউনিভার্সিটির শরীয়াহ অনুষদের অধ্যাপক পদে নিয়োজিত রয়েছেন।

ওরিয়েন্টালিস্ট মহল বিশেষত গোল্ড যেহেরের চিন্তাধারা ও তার রচনাবলি সম্পর্কে এটাই আমার দীর্ঘ গবেষণার সংক্ষিপ্ত নোট। গোল্ড যেহেরের ব্যাপারে গবেষণালব্ধ বিষয়গুলো আমার السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي গ্রন্থে স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অধীনে উপস্থাপন করেছি। সেখানে আমি এই ইয়াহুদি প্রাচ্যবিদের অন্যায় অপপ্রয়োগ, সত্য থেকে বিচ্যুতি, উদ্ধৃতি নকল করার সময় ইচ্ছাকৃত বিকৃতি, ঐতিহাসিক নানা তত্ত্বের ইচ্ছামাফিক অপব্যাখ্যা, অনির্ভরযোগ্য ও অবান্তর উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের অপচেষ্টা এবং আমাদের আইম্মায়ে কেরাম ও গবেষক আলেমগণ যেসকল জ্ঞান-উৎসের ওপর সর্বসম্মতিক্রমে আস্থা রাখেন, সেগুলো এড়িয়ে যাওয়া বা ভুল অভিহিত করা ইত্যকার বিষয়গুলোর ওপর বিশদ আলোচনা করেছি।

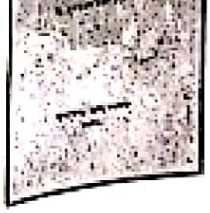
Scanned by CamScanner

এক্ষেত্রে আমেরিকার অবস্থা ইউরোপের মতোই। সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক মনোভাব নিয়ে প্রাচ্যবাদের ঘোরতর চর্চা চলছে। সেখানকারী শীর্ষ বিদ্যাপীঠগুলোতে ইসলামিক স্ট্যাডিজের উপদেষ্টার পদে এমন ওরিয়েন্টালিস্টদেরকেই নিয়োগ দেয়া হয় যারা ইসলামবিরোধী হিংসাত্মক মনোবৃত্তি ও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির খোলকলা দেখাতে পারে। আমি তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা ও তাদের রচনাবলি সম্পর্কে আমার গবেষণালব্ধ মূল্যায়ন ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিম বিশ্বের যেসব শিক্ষার্থী নিজ দেশে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনা করছে তারা অদূর ভবিষ্যতে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে বাধ্য। ইসলামিক স্ট্যাডিজের এ সকল শিক্ষার্থীর সামনে গবেষণার ক্ষেত্রে এ সকল বিষমিশ্রিত উৎসগ্রন্থসমূহের বাইরে অন্য কোনো বিকল্প গ্রন্থ নেই। ওদিকে তারা আরবি ভাষাও জানে না। যার ফলে তারা ধরে নেয় যে, এসকল বিষাক্ত তত্ত্ব খোদ মুসলিম উলামা ও ফিকাহবিদদের কিতাবাদি থেকে সংগৃহীত।

এই দুঃখজনক পরিস্থিতির কারণে বর্তমান যুগ আমাদেরকে আহ্বান করছে যে, আমরা যেন অতি শিগগিরি সমস্ত আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষায় ডক্টরেট সম্পন্ন করার জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষদ প্রতিষ্ঠা করি। আমি প্রচণ্ডভাবে আশাবাদী যে, এ উদ্যোগ নেয়া হলে মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য শিক্ষার্থীর দৃষ্টি পাশ্চাত্যের ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে স্বদেশের আরবি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে ফিরে আসবে। নিঃসন্দেহে তখন আমরা আমাদের এই শিক্ষার্থীদেরকে উগ্র সাম্রাজ্যবাদী চেতনার অধিকারী ওরিয়েন্টলিস্টদের প্রতারণা ও বিষাক্ত কালো থাবা থেকে কোনোমতে বাঁচাতে পারবো।

Scanned by CamScanner



সর্বশেষ নিবেদন

প্রাচ্যবিদ মহল সম্পর্কে সর্বশেষ যে কথাটি বলতে চাচ্ছি, তা হলো– যখন সামরিক ও রাজনৈতিক উভয়ভাবে ক্রুসেডাররা পরাজিত হয় তখন পশ্চিমারা ইসলাম ও মুসলমানদের থেকে ভিন্ন কৌশলে প্রতিশোধ নেওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করে। সেই প্রতিশোধ প্রবৃত্তি থেকেই তারা ইসলামের ওপর স্ট্যাডি করে তার বিভিন্ন খুঁত বের করার মিশনে আত্মনিয়োগ করে। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে তারা ইসলামের ওপর সমালোচনা করার নতুন রণক্ষেত্র উন্মোচিত করবে। ইতিহাসের মধ্যবর্তী যুগগুলোতে পশ্চিমা খ্রিস্টসমাজের ওপর এ জাতীয় ভাবনাগুলোই প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলো। এখান থেকেই তাদের মনে ইসলামি দেশগুলোর ওপর শক্তিপ্রয়োগ, জবর-দখল ও সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের মানসিকতা জন্ম নেয়।

এটি সে সময়ের কথা, যখন মুসলিম জাহান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দিন-দিন অধঃপতনের দিকে ছুটছিলো। তখন থেকে শুরু হয়ে যায় মুসলিম জাহানের একেকটি নগরীর ওপর পশ্চিমাদের থাবা বিস্তারের কালো ধারাবাহিকতা।

যদিও তখন পর্যন্ত মুসলিম জাহানের সিংহভাগ নগরীর ওপর তাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়নি; কিন্তু তার আগেই তারা ইসলাম ও এর ইতিহাসের ওপর গভীর অধ্যয়ন শুরু করে দেয়। সেখানকার জনসাধারণের মন-মানসিকতার মাঝে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির অনুপ্রবেশকে বৈধরূপে উপস্থাপন করার জন্যে তারা এই নেতিবাদী চর্চা শুরু করে দেয়। যার ধারাবাহিকতায় বিগত শতাব্দীতে তারা গোটা ইসলামের ওপর ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্ট্যাডি সম্পন্ন করে। কিন্তু

Scanned by CamScanner

তাদের এই গভীর অধ্যয়ন দু'টি প্রাকৃতিক কারণে সফলতার মুখ দেখেনি—

১. ধর্মীয় গোঁড়ামি। যা ইউরোপের রাজনীতিবিদ ও সেখানকার সামরিক জেনারেলদের মন-মগজে চিরকাল প্রধান্য বিস্তার করে রেখেছে। এমনকি যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে তখন লর্ড এলবেনি তার সেই বিশ্ববিখ্যাত মন্তব্যটি করেছিলো যে, 'আজ সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রুসেড যুদ্ধ শেষ হলো।'

বাকি রইলো তাদের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, তার প্রভাব এখন পর্যন্ত তাদের সেসব বই-পুস্তকের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে, যা পশ্চিমারা ইসলাম ও এর সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে রচনা করেছে। হ্যাঁ, আমরা ইসলাম ও এর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ওইসব পশ্চিমা পণ্ডিত ও ঋষি-মুণির কাছে সর্বাধিক ন্যায়সঙ্গত আচরণ পেয়েছি, যারা তাদের রচনাবলির মাঝে নিজ নিজ নৈতিকতা ও বিশ্বস্ততার স্বাক্ষর রেখেছেন। এক্ষেত্রে আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে حضارة الإسلام বইটিকে পেশ করবো। বইটি লেখেছেন গ্যাস্টফ লোবন। এটিই সেই গ্রন্থ যা ইসলাম ও এর সভ্যতা সম্পর্কে ন্যায্য দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে।

এর কারণ হলো, এর লেখক হচ্ছেন একজন বস্তুবাদী চেতনার দার্শনিক। তিনি পৃথিবীর কোনো ধর্মেই বিশ্বাসী নন। ওদিকে ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে তার মনে কোনো গোড়া মনোবৃত্তি-ও ছিলো না। যার কারণে একজন শেকড়সন্ধানী লেখক হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমা বুদ্ধিজীবিদের সমাজে তিনি ঠিক সেই মূল্যায়নটি পাননি, যার তিনি যোগ্য ছিলেন।

নিঃসন্দেহে তিনি ঈসাঈ ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিকতা ও ইতিহাস শাস্ত্রের প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এরপরও পশ্চিমা সুশীল সমাজ, বিশেষত ফরাসি বুদ্ধিজীবি মহল তার ওপর নানাভাবে অন্যায় ও অন্যায্য আচরণ করেছে।

২. ইংরেজি অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমারা বস্তুবাদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় তরতর করে অনেক উন্নতি করেছিলো। এই উন্নতি সেখানকার পণ্ডিত ও লেখকদের মনে প্রচণ্ড অহমিকা সৃষ্টি করে। এমনকি তারা এ কথা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, একমাত্র মিসরি সভ্যতা

Scanned by CamScanner

ব্যতিরেকে পৃথিবীর অন্য সকল সভ্যতার মূল বুনিয়াদ হলো পশ্চিমা সভ্যতা। পশ্চিমা বিবেকই প্রাকৃত বিবেক। একমাত্র পশ্চিমা বিবেকের মাঝেই সূক্ষ্মদর্শিতা এবং যেকোনো বিষয় সুষ্ঠু ও যৌক্তিকভাবে ভাবার ক্ষমতা রয়েছে। এর বাইরে পৃথিবীতে যারাই আছে, বিশেষত মুসলিম সমাজ, তারা খুবই স্থূল ও সরল। আরেকটু শুদ্ধভাবে বললে, মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তি হলো অণুর সমান। এ ধরনের বক্তব্য প্রসিদ্ধ ওরিয়েন্টালিস্ট 'গিব' তার وجهة المسلمين বইয়ে ব্যক্ত করেছে। তার এ বক্তব্যের অর্থ হলো, মুসলিম বুদ্ধি প্রতিটি বিষয়কে ক্ষুদ্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। তারা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত নয়।

পশ্চিমাদের মাঝে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার কারণ হলো, তারা দিব্যচোখে দেখতে পেয়েছে— মুসলিম জনগণ এতোটাই দুর্বল যে, তারা অনায়াসে তাদের ওপর সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। অজ্ঞতা তাদের মাঝে ভয়াবহ আকারে বিস্তার লাভ করেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা ভীষণরকম পশ্চাদপদতার শিকার।

কিন্তু যখন এই শতাব্দীর সূচনালগ্নে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ গড়ে উঠতে শুরু করে। মুসলিম সমাজে শিক্ষা-দীক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে তখন ইসলামি শরীয়তের উলামায়ে কেরাম ব্যতিরেকে অন্যদের অবস্থা হলো, বিশেষত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মহল দেখতে পেলো যে, আমাদের মুসলিম জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যগুলো বিভিন্ন প্রাচীন ও অবিন্যস্ত কিতাবাদির মাঝে বিক্ষিপ্তাকারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ইউরোপিয়ান লেখকদের মতো সেগুলো গুছালো ও সুবিন্যস্ত নয়। এখন যদি আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর গবেষণা করতে হয় তাহলে ইসলামি গ্রন্থাগারগুলোতে প্রাচ্যবিদদের ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে লেখা বই-পুস্তক ছাড়া আলোচনার অন্য কোনো উৎস নেই। এই বইগুলো প্রাচ্যবিদরা গভীর অধ্যয়ন করেই সংকলন করেছে। এমনও হয়েছে যে, একেকজন ওরিয়েন্টালিস্ট আমাদের সংস্কৃতির একেকটি বিষয় সম্পর্কে একটি বই লেখার জন্যে বিশ বছর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছে। দীর্ঘ এ সময়ে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে যে, প্রতিটি বিষয় আমাদের আদি যুগের আলেমদের প্রাচীন উৎসগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করবে।

যার ফলে দেখা যায়, এখন পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ দীর্ঘ দিনের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম, সবকিছু ছেড়ে এই এক বিষয় নিয়ে পড়ে থাকা এবং তাদের

Scanned by CamScanner

ধর্মীয় ও সাম্রাজ্যবাদী মন-মানসিকতা —যার দিকে আমি ইতোপূর্বে ইঙ্গিত করেছি— ইত্যকার বৈশিষ্ট্যের ফলে আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে এমনভাবে আলোচনা পেশ করছে যে, তা শুনে আমাদের শিক্ষিতমহল প্রচণ্ড বিস্মিত হচ্ছে। তাদের সর্বগ্রাসী আলোচনাগুলো শুনে এরা এতোটাই মুগ্ধ হচ্ছে যে, এরা অজান্তেই তাদের ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে পড়ছে। বিশেষত যখন মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত সমাজ আমাদের জ্ঞানজ বইগুলোর বর্ণনাশৈলীর সঙ্গে তাদের বইয়ের বর্ণনাশৈলী তুলনা করে তখন তারা দেখতে পায় যে, তথ্যের বিপুলতা ও প্রাচুর্য্যের বিচারে তাদের বইগুলো অনেক এগিয়ে। যার ফলে তারা তাদের রচনাবলির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়। পরবর্তীকালে তারা তাদের প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাঝে পশ্চিমাদের গবেষণালব্ধ রচনাবলি থেকে রেফারেন্স টুকতে শুরু করে। তাদের বই-পুস্তক থেকে অন্ধের মতো উদ্ধৃতি চয়নের কারণ হলো, তারা সেগুলোকে সত্য মনে করে। যদি তাদের কোনো কথা মুসলিম লেখকদের শাশ্বত নীতিমালার পরিপন্থী হয় তখন তারা মনে করে যে, পশ্চিমাদের সিদ্ধান্তই সঠিক। কারণ, তারা কখনই সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিবৃত্তিক মাপকাঠির বাইরে যান না। এবং তারা সত্যের মানদণ্ড থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হন না।

এখান থেকেই তাদের মাঝে ইউরোপিয়ানদের গবেষণা ও তাদের চিন্তাধারার ওপর আস্থা জন্মাতে শুরু করে।

মুসলিম সমাজের এই শিক্ষিত মহলটির কখনই এই সৌভাগ্য হয়নি যে, তারাও ওই সকল ইসলামি জ্ঞান-উৎসের দ্বারস্থ হবে যেখান থেকে ওই-সব ওরিয়েন্টালিস্ট ও অপরাপর ইউরোপিয়ান গবেষক আহরণ করেছেন। এই ভাগ্য-বঞ্চনার পেছনে কয়েকটি কারণ হতে পারে। হয়তো আমাদের জ্ঞান-উৎসগুলোর শরণাপন্ন হওয়ার কোনো পথ তারা পায়নি। অথবা ত্বরাপ্রবণ মানসিকতার কারণে তারা চটজলদি বুদ্ধিবৃত্তিক পরিণতিতে উপনীত হতে চাইছিলো। অথবা তাদের মনে এ খায়েশ জন্মেছিলো যে, তারা এমন কিছু নতুন তত্ত্ব নিয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় নিজেকে নিয়ে আসবে যা আমাদের ধর্মীয় ও জ্ঞানচর্চারত মহলের কাছে অভিনব মনে হবে।

এভাবে দীর্ঘ দিন আমরা আমাদের হীনম্মন্যতাবোধ, মানসিক বৈকল্য এবং ইউরোপিয়ান গবেষকদের তুলনায় আমাদের আস্থাহীনতা ও তাদের প্রতি আমাদের সীমাতিরিক্ত আস্থার কারণে আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর

Scanned by CamScanner

যুগ জুলুম করেছি। জুলুমের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। এক পর্যায়ে আমাদের মাঝে রাজনৈতিক জাগরণী আন্দোলন শুরু হয়। ইউরোপিয়ানদের উপনিবেশ থেকে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করি। তখন আমাদের মাঝে চৈন্তিক স্বাধীনতা, আত্মসম্মানবোধ এবং নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের মাঝে মূল্যবোধ জেগে উঠতে শুরু করে। যার ফলে এতোদিন আমরা যেভাবে নিজেদের ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও শরীয়ত জানার জন্যে মুসতাশরিকদের ওপর নির্ভর করেছিলাম, তা নিয়ে খোদ নিজেদের মাঝেই অনুতাপ-অনুশোচনা জাগতে শুরু করে। এই জাগরণটি মূলত শুরু হয় আমাদের শিক্ষিত সমাজ ও তৎসংলগ্ন মহলের মাঝে। এখন আমরা নিজেরাই তাদেরকে পশ্চিমাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে পারছি। তাদের রচনাবলি ও তার নেপথ্যের সাম্রাজ্যবাদী ও ধর্মীয় স্বার্থের মুখোশ উন্মোচন করতে পারছি।

এখন আমরা নিরন্তর এই লক্ষ্য অভিমুখে পথ চলছি। যদিও আমাদের জাগরণী শক্তি ও নিজস্ব স্বাধীনতা অদ্যাবধি পরিপক্ক হয়ে ওঠেনি, বা পূর্ণতা পায়নি। পৃথিবীর বিষয়-আশয়গুলোতে এটাই মহান আল্লাহর চিরন্তন বিধান।

কিন্তু আল্লাহ চাহেন তো, একদিন আমরা সেই স্তরে উন্নীত হবো, যখন আমাদের অনাগত প্রজন্ম বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে ভাববে যে, কী করে এতদিন আমাদের পূর্বপুরুষরা এতোটা সরল ছিলেন! কীভাবে তারা দীর্ঘকাল ওরিয়েন্টালিস্টদের প্রতারণার জালে ফেঁসে ছিলেন!

শিগগিরি এমন দিন আসবে, যখন আমরা ইউরোপিয়ানদের ঐতিহ্য ও তাদের ধর্ম, কৃষ্টি, কালচার; তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করবো। সেখান থেকে খুঁজে খুঁজে দোষ বের করবো। আল্লাহ চাহেন তো এমন দিন আসবে যখন আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সমালোচনা ও নিরীক্ষণের সেই মাপকাঠি ও নীতিমালা —যা পশ্চিমা বুদ্ধিজীবি মহল প্রণয়ন করেছে— খোদ তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিশ্বাস-চিন্তাধারা পরখ করার কাজে প্রয়োগ করবে। তখন নিঃসন্দেহে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। দোষারোপের সেই জঞ্জাল খোদ তাদের ওপর উগড়ে পড়বে, যা এতো দিন তারা আমাদের বিশ্বাস ও আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার ওপর ছোড়ার চেষ্টা করেছে। আমরা তাদের হাঁটুকাঁপার দৃশ্য দেখার অপেক্ষা করছি।

Scanned by CamScanner

দেখুন, পশ্চিমারা কুরআন ও সুন্নাহ পরখ করার জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনার যেই মাপকাঠি ও নীতিমালা দাঁড় করিয়েছে, যদি সেই মাপকাঠি ও নীতিমালা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ ও তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিদ্যাগুলোর নিরীক্ষণ করার কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের গর্বের ধন কিতাবি বিদ্যা ও ধর্মগ্রন্থগুলোর অন্তসারশূন্যতা প্রকট আকারে দৃশ্যমান হবে। প্রতিরোধের কোনো প্রমাণই তাদের হাতে থাকবে না।

লক্ষ্য করুন, বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনার যেই নীতিমালা প্রাচ্যবিদ মহল আমাদের ইতিহাস ও আমাদের ইমামদের সমালোচনার সময় ব্যবহার করেছে, যদি ভবিষ্যতে মুসলমানগণ এই ইউরোপিয়ান কৃষ্টি-কালচারের ইতিহাস, তাদের ধর্মবিশ্বাস, তাদের বিজয়ী বীর, পণ্ডিত ও নেতাদের সমালোচনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তখন কি মুসলমানরা এ সকল সন্দেহ ও অপধারণার পরিণতিতে এমন কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে না, যা প্রাচ্যবিদরা আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আমাদের মনীষীদের ক্ষেত্রে আবিষ্কার করেছে! তখন কি তাদের সেই কৃষ্টি-কালচারের কঙ্কাল দেহ বেরিয়ে আসবে না! ভদ্রতার পোশাকের আড়ালে তাদের নগ্ন শরীরের হাড়-গোড়, অস্থি-মজ্জা প্রকাশ পাবে না! ওই কৃষ্টি-কালচার যে সকল জ্ঞানী-গুণী, ঋষি-মুনি বহন করছেন তাদের বিবর্ণ চেহারার ফ্যাকাশে রূপ ব্যাদান হবে না! তখন তো এটাই দেখা যাবে যে, সেখানে কোনো আভিজাত্য নেই, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই, নৈতিকতা ও বিবেকের স্ফূরণ নেই।

আমার বড় ইচ্ছে করে, আমাদের মধ্য হতে কিছু লোক তাদের সভ্যতা, ঐতিহ্য ও তাদের বড়দের ব্যাপারে ঠিক সেই শৈলীতে কলম ধরবে, যে শৈলীতে প্রাচ্যবিদরা আমাদের বিরুদ্ধে মসি চালিয়েছে। অর্থাৎ নর্দমা খুড়ে ফেলে দেওয়া তথ্য খুঁজে বের করবে। ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিগুলোকে ভুল পদ্ধতিতে বোঝানোর চেষ্টা করবে। বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর দোষের পোশাক পরাবে। ইউরোপবাসী বিশ্বকে যে-সব কল্যাণকর বিষয় উপহার দিয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ের জীবাণু ছড়াবে। যদি এমনটি করা হয় তাহলে তাদের সভ্যতার, তাদের জন-জীবনের ওই চিত্রটাই ফুটে ওঠবে, যা হবে চরম লাঞ্ছনাকর ও বিদ্রুপাত্মক। তখন কিন্তু অন্যদের আগে এই প্রাচ্যবিদরাই চিৎকার-চেচামেচি শুরু করে দেবে।

Scanned by CamScanner

হতে পারে, আমাদের মধ্য হতে কেউ এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে। সমালোচনার যেই মানদণ্ড ইউরোপিয়ান বুদ্ধিজীবি মহল দাঁড় করিয়েছেন, যার কথা একটু আগে আমি বলেছি, সেই মানদণ্ড আমাদের কেউ তাদের ওপর প্রয়োগ করবে। সেই মানদণ্ডের আলোকে তাদের ধর্মবিশ্বাস, শিক্ষা, সভ্যতার চিত্র অঙ্কনের কাজে এগিয়ে আসবে। ওরিয়েন্টালিস্ট মহল যখন তাদের এই গবেষণামূলক কাজগুলো পড়বে আর দেখবে যে, এটাই তো সেই পুরনো পদ্ধতি, যা এতো দিন তারা আমাদের মুসলমানদের ধর্ম ও ইতিহাসের মৌলিকত্ব জানার কাজে ব্যবহার করেছে তখন তারা বিপদের ভয়াবহতা বুঝতে পারবে। হতে পারে, তখন তারা এতো দিনের বিকৃতি, মিথ্যাচার ও ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি প্রচারের অপকর্মগুলোর ওপর অনুতপ্ত হবে।

আমি মনে করি, সেই যুগের অবসান ঘটেছে, যে যুগে আমরা আমাদের জ্ঞান, ঐতিহ্য ও ইতিহাস জানার জন্যে এ-সব ইউরোপিয়ানদের উৎসগ্রন্থের শরণাপন্ন হতাম। অথচ আমাদের হাতে মুসলমানদেরই রেখে যাওয়া প্রচুর ও সর্বগ্রাসী জ্ঞান-ভাণ্ডার রয়েছে। যদিও ইতোপূর্বে আমরা সেগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলাম না।

কাজেই এখন আমাদের আবির্ভাবের সময় হয়েছে। আমাদের কপাল থেকে আমাদের জ্ঞান-উৎস না জানার লাঞ্ছনা ঝেড়ে ফেলার সময় হয়েছে। আমাদের ভাষা সম্পর্কে, আমাদের ধর্মবিশ্বাসের সত্যাসত্য জানার ক্ষেত্রে, আমাদের মনীষীদের পদ-মর্যাদা নিরুপণের ক্ষেত্রে এতো দিন আমরা বিদেশীদের ওপর নির্ভরশীল থেকে নিজেদের যেভাবে অবমাননা করেছি, নিজের জাতিসত্তার ওপর যেই অবিচার করেছি, এখন সেই আত্মলাঞ্ছনার কলঙ্ক মুছে ফেলার সময় হয়েছে।

এই সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন প্রাচ্যবিদরা আমাদের কাছে এ প্রত্যাশাই করে যে, আমরা আগের মতো নিজেদের জ্ঞানী-গুণীদের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ে ডুবে থাকবো। আর প্রাচ্যবিদদের সম্পর্কে সুধারণা রাখবো।

নিঃসন্দেহে এখন সেই শুভ লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। আমাদের আঁচল সেপ্টে থাকা ধূলো-বালি ঝেড়ে ফেলার, আমাদের মাটি চাপা জ্ঞান-ঐতিহ্য বিশ্ববাসীর সামনে মেলে ধরার সময় হয়েছে। আমাদের অন্তকরণে,

Scanned by CamScanner

আমাদের মস্তিষ্কে জাগরণের সূর-লহরী ছড়িয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে। আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন জাতি হিসেবে বিশ্বমঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার শুভ লগ্ন চলে এসেছে।

যদিও এমন কিছু লোক এখনও আছেন, যাদের প্রাচ্যবিদদের সম্পর্কে মোহ কাটেনি। আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের চিন্তাধারাকে যারা এখনও বরণ করেন। যাদের বিশদ আলোচনা আমি আমার লেখা السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ও অন্যান্য গ্রন্থে তুলে ধরেছি। আমি প্রাচ্যবিদদের বিষাক্ত ছোবল সম্পর্কে যেভাবে মুখোশ উন্মোচন করেছি, তা যদি তারা শীতল মস্তিষ্কে পড়ে দেখেন, তাহলে আশাকরি তাদের সামনে প্রকৃত বাস্তবতা ফুটে ওঠবে। তারা বুঝতে পারবে, এরা কোন ক্ষেতের ঘুঘু!

গোল্ড যেহেরদের মতো বিভ্রান্তি পটিয়সী ও বিকৃতিবাজ লেখকদের বিরুদ্ধে যদিও আমরা শক্ত অবস্থান নিয়েছি; কিন্তু এর বিপরীতে আমরা অবশ্যই সেসব ন্যায়নিষ্ঠ প্রাচ্যবিদকে শ্রদ্ধার চোখে দেখি, যারা আমাদের প্রাচীন মূল্যবান কিতাবাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে, সেগুলোর মূল রূপ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অক্লান্ত শ্রম ব্যয় করেছেন এবং এক্ষেত্রে তারা সততার মানদণ্ড থেকে বিচ্যুত হননি। কারণ, আমরা স্বীকার করি যে, জ্ঞান কারো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়।

ইসলাম হলো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে আল্লাহর উপহার। এই ইসলাম বোঝার অধিকার কোনো নির্দিষ্ট জাতি-গোষ্ঠীর জন্যে বিশেষায়িত হতে পারে না। পৃথিবীর যে কোনো মানুষ এই ইসলামকে বোঝার অধিকার রাখে। যতোটুকু ইচ্ছে বোঝার অধিকার তার আছে। তবে শর্ত হলো, অবশ্যই তাকে আলিমসুলভ গুণে গুণান্বিত হতে হবে। আলেমসুলভ গুণ হলো— তাকে সাম্যবাদী হতে হবে, সত্যের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ নিষ্ঠাবান হতে হবে এবং যেকোনো ধরনের গোঁড়ামি, উগ্রতা ও প্রবৃত্তিতাড়িত স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে নিজেকে উন্নীত করতে হবে।

স মা প্ত

Scanned by CamScanner

ড. মুসতফা আস-সিবাঈ

প্রাচ্যবিদদের ইসলামচর্চার নেপথ্যে

আবদুল্লাহ্ আল ফারুক
[অনূদিত]

Scanned by CamScanner